অধ্যাপক অভী দত্ত মজুমদার স্মারক বক্তৃতা, সপ্তম বর্ষ

প্রকৃতি বনাম মানুষঃ একটি পরিকল্পিত সংঘাত

বক্তা ঃ অধ্যাপক মাধব গ্যাডগিল

ভাষান্তর ঃ মৈত্রী দাস

একটি ‘একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ (ফামা)’ প্রকাশনা

প্রকৃতি বনাম মানুষঃ একটি পরিকল্পিত সংঘাত
মাধব গ্যাডগিল
ভাষান্তর ঃ মৈত্রী দাস
প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা, ২০২২

প্রকাশকঃ ‘একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ (ফামা)’-র পক্ষ থেকে আশিসকুসুম ঘোষ।
ঠিকানাঃ ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬
যোগাযোগ/হোয়াটস্যাপ - ৯৪৩৩০০৮১১৭
মুদ্রণঃ দত্ত প্রিন্টার্স, ১১৩ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা।

সাহায্য : ১৫ টাকা

অতিমারি নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত গাফিলতি ও অব্যবস্থার কারণে বিগত বছর দু'য়েকে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকেরা। এক অভূতপূর্ব গৃহবন্দীত্বে আটকে থেকেছে স্বাভাবিক সামাজিক জীবন। অতিমারিজনিত বাধা, নিষেধাজ্ঞার কারণে একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ (ফামা)'র ২০২০ সালের প্রতিষ্ঠা দিবস ২৬ জুলাইয়ের বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা আমরা অনুষ্ঠিত করতে পারিনি। সরকারী অতিমারী বিধি রুজু থাকার কারণে ২০২১-সালের স্মারক বক্তৃতাও সভাকক্ষে করার প্রয়োজনীয় অনমতি মেলেনি। অগত্যা, অনলাইন মাধ্যমে 'অভী দত্ত মজুমদার স্মারক বক্তৃতা, সপ্তম বর্ষ' করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এবারের বক্তা ছিলেন খ্যাতনামা সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ ও সেন্টার ফর ইকোলজিকাল সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মাধব গ্যাডগিল। বক্তব্যের বিষয় ছিল 'প্রকৃতি বনাম মানুষঃ একটি পরিকল্পিত সংঘাত'। সভায় আহ্বায়কদের পক্ষ থেকে অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মু ফামা'র কর্মধারা, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও স্মারক বক্তৃতার বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। ফামা'র কনিষ্ঠতম সদস্য টোড়ি দত্ত মজুমদারের ভাষ্যে ফামা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অকালপ্রয়াত অধ্যাপক অভী দত্ত মজুমদারের সংগ্রামী জীবনের স্মৃতি উঠে আসে।

স্মারক বক্তৃতার কারিগরি সহায়ক Prohor.in বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে সম্প্রচার করে যার ফলে প্রায় ৮০০০ দর্শকের কাছে এবারের সভা পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। ফামা'র অন্যতম সদস্য আশিষ কুসুম ঘোষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন। আমরা ফামা'র অন্যতম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু অনিতেশ চক্রবর্তী ও টিম-প্রহরের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ কারিগরি সহ বিবিধ সহায়তার জন্য।

অধ্যাপক গ্যাডগিলের মূল বক্তৃতাটি পরিবর্ধিত রূপে ইংরেজি ভাষায় ইতিমধ্যেই ২০২২ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। সেইটির বাংলা ভাষান্তর প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। গল্পের ছলে, গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তিগত যাপনের অভিজ্ঞতা এমনকি প্রশাসক ও আইন প্রণেতা গ্যাডগিলের চিন্তা, বিশ্লেষণ ও ক্ষোভ বেশ স্পষ্ট রূপেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখনিতে। এক কথায় বইটিতে লেখকের দৃষ্টিতে প্রজাতি তথা প্রকৃতি পরিবেশ সংরক্ষণে ভারতীয় রাষ্ট্র ও এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সংঘাতের বাস্তব চিত্র এবং রাজনৈতিক ও দার্শনিক দ্বন্দ্বের চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে। অধ্যাপক গ্যাডগিল সহৃদয়তার সঙ্গে বইয়ের রয়্যালটি দাবী করছেন না।

বাংলা বইটি প্রকাশিত হতে পারত না শ্রী পার্থ দে, হিন্দোল আহমেদ, দেবেশ সাঁতরা, শুচিশ্রী চ্যাটার্জী, বন্দনা মন্ডল, ইমন সাঁতরা ও সুরমিতা কাঞ্জিলাল এবং মৈনাক মাইতির সাহায্য ছাড়া। এঁরা সকলেই আমাদের বন্ধু, কমরেড। তাই আগামী দিনেও তাদের দু'হাত ভরা সাহায্যের অপেক্ষায় থাকব।

আমরা আশান্বিত যে আগামী প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর স্মারক বক্তৃতায় আপনাদের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাত হবে।

সংগ্রামী অভিনন্দন,

-জ্যোতির্ময়, ঈশিতা, মেরুনা
আহ্বায়কবৃন্দ, ফামা

বাস্তুতান্ত্রিক বিচক্ষণতা

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী এক ধরণের একচেটিয়া আগ্রাসন সম্পর্কে আমার কিছু ভাবনা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে আমি আপ্লুত। আন্তর্জাতিক পর্যটনের আগ্রহেই এই আগ্রাসনটি ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপিত, প্রচারিত। এই আগ্রাসন বনদপ্তরের হাতকেই বহুদূর প্রসারিত করেছে। বনদপ্তর হল ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি সংস্থা, যা এই দেশের গ্রাম-কৌমগুলির সার্বজনীন সম্পত্তিরূপী সম্পদগুলিকে দখল ক'রে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করতে সাহায্য করেছে। ভারতীয় সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে তার স্ব-কে প্রত্যক্ষ করেছে জৈবিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে। শুধুমাত্র অন্য মানুষদের অন্তর্ভুক্তি নয়, গাছপালা, অন্যান্য প্রাণী, এমনকি পাহাড় এবং নদীও যার অংশ। এই বিশ্বদৃষ্টির শিকড় প্রোথিত রয়েছে বেঁচে থাকার জন্য বাস্তুতান্ত্রিক কাজগুলি সম্পন্ন করতে কৌম-সম্প্রদায়ের সমস্ত অন্য সদস্যদের প্রয়োজনীতার কদর করায়, কৃতজ্ঞতা জানানোয়। এর প্রকাশ দেখা যায় রাজস্থানের ভরতপুরের কেওলাদেও ঘানা, তামিলনাড়ুর চেন্নাই-এর কাছে ভেদানথংগলে, কর্ণাটকের মাইসোর জেলার কোক্রে বেলুরে নানা ধরণের বক, সারস জাতীয় প্রাণী ও পেলিকান জাতীয় জলের পাখিদের প্রজনন বসতিগুলির সংরক্ষণের মধ্যে। এই প্রসূতি পাখিগুলি যদিও খুব সহজ শিকার ছিল কিন্তু অত্যন্ত যথাযথভাবেই প্রজননঋতুতে এদের রক্ষা করা হত, যাতে প্রজননের জন্য তারা বসতি স্থাপন করতে পারে। এরা চাষিদের খুব মূল্যবান সার উপহার দিত বছরের পর বছর। আবার প্রজনন ঋতুর বাইরে খুব আনন্দ করেই এই পাখিদের শিকার করা হত। বাস্তুশাস্ত্রবিদরা বলবেন এটি বিচক্ষণতার একটি খাঁটি উদাহরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাবস্থাপকরা বলবেন স্থিতিশীল সদ্ব্যবহার। এই ধরণের বহু চর্চা ভারতে বহুক্ষেত্রেই শতকের পর শতক ধ'রে প্রচলিত, যা ভারতকে বন্যপ্রাণের সঙ্গে জড়িয়েজাপ্টে থাকা বৃক্ষরাজির এক মহাসমুদ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল; ব্রিটিশ শোষণে কৌমগত ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত।

সামাজিক বিবাদ

ভারতীয়রা হয়তো প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিতেই বেঁচেবর্তে ছিল, তবে নিজেদের ভেতর আদৌ শান্তি ছিল না। সমাজের অভ্যন্তরে তীব্র বিবাদ ছিল; যা আজকের আধুনিক দিল্লির অদূরে খান্ডব অরণ্য দহনের মতো ঘটনায় চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতের এই বিখ্যাত ঘটনার বর্ণনায় বলা আছে কৃষ্ণ, অর্জুনরা জঙ্গলের আশেপাশে কড়া নজর রেখেছিলেন। বেছে বেছে নাগা জনজাতির প্রত্যেককে এবং যেসব প্রাণীরা আগুনের জ্বলন্ত শিখা থেকে পালানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করেছিলেন। চূড়ান্ত অবিচারে ভরা, স্তরবিন্যস্ত ভারতীয় সমাজ কীভাবে গঠিত হয়েছিল, এটা তারই একটা যথযথ উদাহরণ। একমাত্র গৌতম বুদ্ধ যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী ছিলেন, যিনি এইসমস্ত বৈষম্যের বিরোধিতা করেছিলেন, জ্ঞানের ওপর উচ্চবর্ণের একাধিপত্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন। দুঃখজনকভাবে ভারতীয় সমাজে তাঁর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভারতীয় সমাজ আবারও অবিচারপূর্ণ, একাধিপত্যকামী বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আমাদের সিদ্ধান্তকে অনেক বেশি জোরালো করার কথা জ্ঞান এবং যুক্তির। তবে এগুলির কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের মূল্যবোধই আমাদের পদক্ষেপগুলির দিশা নির্ধারণ করে। ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে, দেশের প্রগতিশীল সংবিধান মোতাবেক আমরা সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক ন্যায়— এই মূল্যবোধগুলি মেনে চলতে

বাধ্য। তবে বর্তমান ভারতে প্রকৃতি সংরক্ষণের সন্দর্ভে যে দু'টি দর্শনের আধিপত্য, সেগুলি এই মূল্যবোধগুলিকে স্পষ্টতই নাকচ করছে। এর মধ্যে প্রথমটি হল 'সর্বাগ্রে বন্যপ্রাণ'-এর দর্শন; যা বলে— বড় স্তন্যপায়ী এবং পাখি সংরক্ষণ করতে হবে সাধারণ মানুষ তথা অন্য সমস্ত কিছুর কল্যাণের মূল্যের বিনিময়ে। অন্য দর্শনটি বলে— সবরকম মূল্যের বিনিময়েই আমাদের জিডিপি বৃদ্ধির নামান্তর 'উন্নয়ন'-এর প্রচার করা উচিত। এই সমস্ত মূল্যই অবশ্যম্ভাবীভাবে চেপে বসেছে দুর্বলতর অংশের মানুষের ওপর এবং প্রাকৃতিক পুঁজির ওপর। দু'টি দর্শনই মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধেও লড়িয়ে দেয়। দু'টি দর্শনকেই প্রত্যাখ্যান করা উচিত এবং তৃণমূল স্তরের মানুষের বাস্তুতান্ত্রিক বিচক্ষণতাকেই আঁকড়ে ধরা উচিত, যারা প্রকৃতির বাস্তুতান্ত্রিক সেবার প্রকৃত মূল্য দিচ্ছেন এবং তাকে রক্ষা করছেন। আমাদের প্রচেষ্টা থাকা উচিত অনেক বেশি সাম্যমুখী এবং সামাজিক ন্যায়পূর্ণ এক সমাজ গড়ার।

১৯৭২-এর স্টকহোম সম্মেলন

পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নটি প্রথম বিশ্ব সন্দর্ভের কেন্দ্রে আসে ১৯৭২ সালের স্টকহোম সম্মেলনে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই সম্মেলনে আবেগমথিত বক্তৃতায় বলেন— দারিদ্র হল প্রধান দূষক, ভারতের উন্নয়নী নীতি দারিদ্র দূর করবে। যার ফলশ্রুতিতে পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ হবে। কিন্তু ১৯৭২-এ কার্যক্ষেত্রে, বাস্তবের মাটিতে সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ কী ছিল? শুধুমাত্র বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন (Wildlife Protection Act (WLPA))-এর ঘোষণা এবং ব্যাঘ্র প্রকল্পের অবতারণা। দু'টিই বাস্তবে সাধারণ মানুষের দারিদ্র না কমিয়ে, বাড়িয়েছে এবং পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালেই গাড়োয়াল হিমালয়ে চিপকো আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। চিপকো আন্দোলন দাবি তুলেছিল বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যেন হিমালয়ের বৃক্ষরাজির বৃদ্ধি রোধ করা না হয়। সাধারণ মানুষের জীবনধারণের জন্য এবং বন্যা এবং ধস থেকে বাঁচার জন্য যেন অন্তত গাছেদের রেহাই দেওয়া হয়। জঙ্গলগুলি যেন সাধারণ মানুষের জীবনধারণ, পরিবেশের সুরক্ষা এবং দেশের জন্য মাটি আর জলের যোগান দিয়ে যেতে পারে।

ব্রিটিশ অভিজ্ঞতা

চিপকো আন্দোলনকারীদের প্রশংসা করতে গেলে এবং তাদের দাবিগুলিকে সরকারের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পদক্ষেপকে বুঝতে হলে জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ ব্যবস্থাপনা বিষয়টির পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ খতিয়ে দেখতে হবে। ব্রিটেনের বেশীরভাগ অরণ্য ও বেশ বড় সংখ্যক বন্যপ্রাণ হারিয়ে গেছে তাদের ভারত বিজয়ের কয়েক শতক আগেই। প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট উইলয়ামের সময়ে। সম্রাট উইলিয়াম শিকার করতে ভালোবাসতেন, তিনিই অরণ্য আইন প্রতিষ্ঠা এবং লাগু করেছিলেন। এই আইন সাধারণ আইনের আওতার বাইরে সক্রিয় ছিল। আইনটি সাধারণ ইংরেজদের শিকারের হাত থেকে ক্রীড়া-পশু ও তাদের বাসস্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অতঃপর, রাজ-অরণ্যে সাধারণের শিকার করাই অবহিত হল 'পোচিং' হিসেবে, শাস্তি ছিল ফাঁসি। ১০৮৬ সালে, তিনি সারা দেশের সমস্ত ভূমিখন্ডকে কিছু সামন্ত প্রভুর মধ্যে ভাগ করে দেন। এই সামন্ত প্রভুরাও সম্রাট উইলিয়ামের দেখানো পথেই হাঁটলেন। সাধারণ মানুষের জমি দখল করলেন। জমিগুলো ঘিরে

ফেললেন এবং সাধারণ মানুষকে তাদের কৌমভূমি চাষাবাদের অধিকার, শিকারের অধিকার ও পশুচারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। অর্থাৎ, ব্রিটেন এমন এক ব্যবস্থার প্রচলন করল, যেখানে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এবং কৌম-নিয়ন্ত্রণ অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। পরবর্তী দুই শতক ধরে চলা কৃষক প্রতিবাদ কড়া হাতে দমন করা হয়েছিল। ফল হয়েছিল সর্বনাশা। ব্রিটেন তার অনেকখানি বনাঞ্চল ও অজস্র বন্য পশু হারিয়েছিল চতুর্দশ শতকের মধ্যেই।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

ব্রিটিশরা মারাঠা নৌসেনাদের তাগড়াই সেগুন কাঠের জাহাজ দেখেছিল। তারা তাদের দেশের প্রায় নিঃশেষিত ওক গাছের বদলে এই কাঠ ব্যবহার করতে চাইছিল। ১৭৯৯ সালে তারা টিপু সুলতানকে পরাজিত করে এবং দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। তারা টিপুর শাসনাধীন সমগ্র অঞ্চলে রাজা হিসেবে চন্দন কাঠের ওপর টিপুর স্বত্ত্বকে অনুকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ইংরেজরা ভারতের বনজ সম্পদ ব্যবহারের জন্য দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছিল। একটি হল কৌমভূমিকে রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত করা, দ্বিতীয়টি হল সরাসরি সমস্ত সেগুন গাছকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পত্তি হিসেবে দাবি করা। সে সময় পবিত্র বনাঞ্চলের এক প্রকার অন্তর্জাল সারা দেশেই ছেয়ে ছিল। মারাঠাদের সেগুন বৃক্ষসৃজনের মতো এটিও ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু ব্রিটিশরা চাষিদের জমি থেকে সেগুন গাছ কাটতে শুরু করলে তুমুল শোরগোল প'ড়ে যায়, যার জেরে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তারা তাদের বনকেন্দ্রিক সংস্থান বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী তিন দশক ছিল সারা দেশজোড়া লাগামহীন বৃক্ষচ্ছেদনের সময়।

অরণ্য ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ

১৮৫৭ সালের যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের কাছে বেশ বড়সড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতির কারণে যে ব্যাপক বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছিল, তা থেকে উদ্ভূত অসন্তোষ সামাল দেওয়া। তাই, তারা এই সমস্যার সমাধান করলো একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অরণ্য ব্যবস্থাপনার সূচনার মধ্যে দিয়ে। প্রশ্নটা ছিল এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বোঝাপড়াটি এলো কোথা থেকে? ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের বনাঞ্চল ধ্বংস করেছে। তাদের দেশে বন ব্যবস্থাপনার কোনো ঐতিহ্যই ছিল না। তারা জোর ক'রে তখনও পর্যন্ত ইউরোপের বাকি যে অংশটুকু বনাচ্ছাদিত ছিল, সেখানেও একই ঘটনা ঘটালো। এক্ষেত্রেও আরেকটা খুব বড় পার্থক্য ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে তখনও কৌম মালিকানা ছিল। যার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হল স্যুৎজারল্যান্ড। এই পাহাড়ি দেশের বনাঞ্চলের একটা বড় অংশ ধ্বংস হয়েছে ১৮৬০-এর দশকে। কিন্তু ভূমিধসের জন্য প্রচুর জমি ধ্বংস শুরু হ'লে, মানুষ জেগেছিলেন এবং অরণ্য বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এখন সেখানে দুর্দান্ত বনাচ্ছাদন (forest cover) রয়েছে। সবক'টির মালিকানাই স্থানীয় কৌমের, কোনোটিই রাষ্ট্রের বনদপ্তরের অধীন নয়।

স্থানান্তরী চাষ নিষিদ্ধ হল

কোনো ইংরেজকে না পেয়ে, ব্রিটিশরা জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী দিয়েত্রিচ ব্র্যান্ডিসকে ডেকে আনে নব্যস্থাপিত বনাকেন্দ্রিক সংস্থানের জন্য। ব্র্যান্ডিস-এর কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল— গ্রামের কৌম সম্প্রদায় বন ব্যবস্থাপনায় কতটা অংশ নেবে আর রাষ্ট্র কতটা সম্পদ হিসেবে

গ্রহণ করবে। তিনি গ্রামবাসীদের পক্ষে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন।[১] বহু আধিকারিকও সেসময়ে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। তাই, মাদ্রাজের রাজস্ব দপ্তর রাষ্ট্রের জঙ্গল অধিগ্রহণকে 'সংরক্ষণ নয়, বরং বাজেয়াপ্তকরণ' হিসেবে অভিহিত করেছিল। স্থানান্তরী কৃষি (shifting cultivation) ছিল বিবাদের আরও একটি মূল জায়গা। এ সময়ে এইধরণের কৃষি বেশ প্রচলিত ছিল পাহাড়ি অঞ্চলে এবং ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চলে। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গাছ বাদ দিয়ে, বেড়ে ওঠা গাছ পরিষ্কার ক'রে, ঝোপঝাড় কেটে, পরপর ২/৩ বছর মানুষ বাজরা বা মিলেট জাতীয় শস্য চাষ করতেন। তারপর চলে যেতেন অন্য কোনো একটুকরো জমির খোঁজে, আর এই জমি প'ড়ে থাকত ১৫-২০ বছর, বনাচ্ছাদন বেড়ে ওঠার জন্য। বহু ব্রিটিশ আধিকারিকের মতে, এটি গরিব মানুষের জীবনধারণের ভালো বন্দোবস্ত ছিল। তাছাড়া, তারা সমস্ত বন ধ্বংসও করতো না; আম, মহুয়া, হরিতকি এবং অন্যান্য মূল্যবান গাছ রেখে দিত। কিন্তু ব্রিটিশ চা-কফি এস্টেট (বাগিচা)-এর মালিকেরা এই স্থানান্তরী কৃষি চালিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করলো। তারা বলেছিল, জোর করে স্থানান্তরী কৃষি বন্ধ না করলে, তারা তাদের এস্টেটের জন্য মজুর পাবে না। এই এস্টেট মালিকরা এমন মজুর চাইত, যাদের ক্রীতদাসের মতো খাটানো যায়। আসলে, তাদের আত্মীয়স্বজন সকলেই ১৮৬০–এ উত্তর আমেরিকায় কার্পাস চাষে বিপুল পরিমাণ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসকে ভয়ানক শোষণ করেই ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। সবমিলিয়ে, ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল সাধারণ মানুষকে সম্পদহীন ক'রে শুধুমাত্র তাদের সেনাবাহিনী ও নির্মাণকাজের প্রয়োজনে কাঠ উৎপাদনের জন্য জঙ্গলকে উৎসর্গ করা। তাই, তারা স্থানান্তরী কৃষির সঙ্গে সঙ্গে কৌম মালিকানাকেই বেআইনি ক'রে দেয়; ব্র্যান্ডিসকে অগ্রাহ্য করেই সমস্ত কৌম-জমিকে রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে।[২]

বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটি

আসামের দুই চা প্ল্যান্টার এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারতের কফি প্ল্যান্টার ই পি গী এবং এম সি মরিস ছিলেন বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটির (BNHS) দুই প্রভাবশালী সদস্য ও সেলিম আলীর কাছের বন্ধু। সেই সেলিম আলী, যিনি স্বাধীন ভারতের অরণ্য ও বন্যপ্রাণ ব্যবস্থাপনা নীতি রূপায়নে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দু'জনেই ছিলেন প্রথমসারির প্রকৃতিবিদ। যাদের লেখা আমি স্কুলজীবনে বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটির জার্নালে বেশ মনযোগ দিয়ে পড়েছি। ১৯৭৫-এ আমি কর্ণাটকের মাইসোর জেলায় বিলিগিরিরাঙা পাহাড়ে গিয়েছিলাম, তার চূড়োয় থাকা ১১৮ ফুট লম্বা প্রাচীন বৃক্ষকে এক ঝলক দেখতে। বিপুলাকার বৃক্ষটি কান্নাড়ি জনগণের কাছে মিচেলিয়া চম্পক নামে বিখ্যাত, সোলিদাস জনজাতির কাছে পবিত্র। সেলিম আলির তুতো-ভাই জাফর ফুটহেলি আমায় একটা কফি এস্টেটের অতিথিশালায় থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন, যা আগে মরিসের মালিকানায় ছিল। এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজারের যেহেতু পাহাড়ের সৌন্দর্য্য বা বন্যপ্রাণ নিয়ে কোনোরকম উৎসাহই ছিল না, অগত্যা আমি সুপারভাইজার মুকাদামের সঙ্গে আলাপ জমাই। মুকাদাম মরিস পরিবারে বহু বছর ধ'রে কর্মরত ছিল; পরিবারটি এস্টেট বেচে দিয়ে একেবারে ইংল্যান্ড ফেরা পর্যন্ত। উনিই বলেছিলেন যে ব্রিটিশ রাজত্বের সেইসব পুরনো দিনের কথা তার খুব মনে পড়ে; যখন তার হাতের চাবুকটাই ব'লে দিত মজুরদের কতটা খাটনি খাটা উচিত। এখন চাবুক বিদেয় হবার ফলে অনেক বেশি খাটানোর জন্য অনেকটা পরিশ্রম করতে হয়। প্রাথমিকভাবে আমি একটু ধাক্কা খেলেও তেমন অবাক হইনি। আমি তখন রাজা রাও-এর উপন্যাস 'কন্থপুরা' পড়ছিলাম। সেখানে

ব্রিটিশদের সময়ে পশ্চিমঘাট অঞ্চলের চা বাগানের জীবনের এবং এস্টেটের মজুরদের প্রতি ব্যবহারের বেশ বাস্তবোচিত অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। পরে আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রেড টি' (লাল চা)-এর লেখক পল হ্যারিস ড্যানিয়লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। উনি ডাক্তার ছিলেন। তিনি ১৯৪১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত অহমিয়া চা শিল্পে মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি মজুরদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তাদের স্বাক্ষর করা বক্তব্য পেয়েছিলেন, যা দিয়ে তিনি উপন্যাসের জন্য নথি তৈরি করেছিলেন। উপন্যাসটি কল্পকাহিনী হিসেবে রচিত হলেও, তা ছিল 'স্পষ্টত তথ্যাদি নথিবদ্ধকরণের উদ্দেশ্যযুক্ত'। মজুরদের দুঃখজনক অবস্থা এবং আর সি মরিস ও ই পি গী–এর মতো ব্রিটিশ এস্টেট মালিক কিমবা ব্রিটিশ ম্যানেজার এবং ভারতীয় সুপারভাইজারদের আচরণ সম্পর্কে আমার বোঝাপড়াকে ড্যানিয়ল মহাশয় অনুমোদন দিয়েছিলেন।[৩] ২০১৯-এর পুথুমালা ধস এবং ২০২০-র পেতিমুদি ধসের সময়ে যখন খাদের নীচের কুঁড়েঘরে থাকতে বাধ্য হওয়া মজুররা মারা যায়, তখন বোঝা যায় যে তাদের সঙ্গে একইরকমের অসহনীয় ব্যবহার আজও করা হয়ে চলে।

বন পঞ্চায়েত

চা-কফি এস্টেট মালিকদের অবজ্ঞায় মর্মাহত ব্র্যান্ডিস পদত্যাগ করতে চান। তাঁকে শান্ত করতে ব্রিটিশরা গ্রামের বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করতে এবং সেগুলো গ্রামবাসীদের হাতে ব্যবস্থাপনার জন্য তুলে দিতে রাজি হয়। এই বিধানটি ১৯২৭ সালের বন আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের আঠাশ নম্বর অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু কুমায়ুন ও গাড়োয়াল হিমালয়ের কোথাও ১৯৩০-এর আগে একটিও বন পঞ্চায়েত তৈরি করা হয়নি। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্স ইন্সটিট্যুটের একজন সুযোগ্য স্ট্যাটস্টিশিয়ন ডঃ সোমানাথন, খুবই যত্নে এইসব বন পঞ্চায়েতগুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা ক'রে ২০০৮ সালে তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন— রাষ্ট্রীয় বন সংরক্ষণের তুলনায় বন পঞ্চায়েতগুলির কৌমভিত্তিক ব্যবস্থাপনার খরচ প্রতি বর্গ এককে কম; ক্ষতিকর তো নয়ই, সম্ভবতঃ অধিকতর ভালো।[৪]

ভারতীয় বনাঞ্চলের অতিশোষণ

সংবেদনশীলতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি সমানুভূতির কারণে ব্র্যান্ডিস ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি চলে যাবার পর, ইংরেজরা তাঁর সমস্ত বয়ান এবং বাস্তব অবস্থার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে এবং তারপর প্রচার করতে শুরু করে যে, সাধারণ মানুষ অরণ্য ধ্বংস করছে তাই বনাধিকারিকদের কাজ হল বন সংরক্ষণের প্রয়োজনে তাদেরকে জঙ্গলের বাইরে রাখা। বনদপ্তর দাবি করত যে তারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনার স্থিতিশীল প্রয়োগ করছে। বনজ সম্পদ ক্রমাগত শেষ হচ্ছিল, নানাভাবেই। কাঠ ব্যবহার করা হত রেললাইনে পাতা কাঠের তক্তা হিসেবে, রেল-ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসেবে, ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্ট ও ব্রিটিশ চা-কফি এস্টেট স্থাপনের জন্য, ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সেগুন কাঠের তৈরি জাহাজ বানানোর জন্য, কিন্তু উপযুক্ত নথিপত্রের অভাবে এবং গণ-নজরদারী বন্ধ ক'রে দেওয়ার কারণে এইসব ধ্বংসযজ্ঞ কক্ষনো প্রকাশ্যে আসেনি। বনাধিকারিকরা সমানে তাদের নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগের অধিকারের অপব্যবহার করেছে জঙ্গল ধ্বংস করার জন্য আর বনবাসীদের, বনপ্রান্তবাসীদের হেনস্থা করার জন্য। শুধু তাই নয়, তাদের থেকে ঘুষ নেওয়া ও অন্যান্য নানা সুযোগ সুবিধে

আদায় করাও চলেছে সমান তালে। এরা বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী মানুষদের, চা কফি এস্টেটের মালিকদের পক্ষপাতিত্ব করার পাশাপাশি রেল কোম্পানি ও রেয়ন সুতোর কল এবং কাগজ মিলের মতো বনজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল কোম্পানিদেরও পক্ষপাতিত্ব করত।

সেলিম আলী

স্বাধীন ভারতবর্ষে, বন ও বন্যপ্রাণ ব্যবস্থাপনা নীতিগুলি নির্মাণের একজন মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেলিম আলী। উনি ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। আমার ১৪ বছর বয়সে ওনার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ওনার জ্ঞান, স্ফূর্তি, কৌতুক, উদ্দীপনায় মুগ্ধ হয়েই আমিও ফিল্ড ইকোলজিস্ট (মাঠেঘাটে-ঘোরা পরিবেশবিদ) হব বলে মনস্থির করেছিলাম। আমার বাবা ১৯৩০-এর দশকের শুরু থেকেই বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটি (BNHS)-র সদস্য ছিলেন। ১৯৬৩ সালে আমার জন্মদিনে আমায় সেখানকার আজীবন সদস্যপদ উপহার দিয়েছিলেন বাবা। তাই সেলিম আলীর সঙ্গে দীর্ঘ তিন দশক ধ'রে ১৯৫৬ থেকে ১৯৮৬ অবধি, ৯০ বছর বয়সে, ওঁর মৃত্যু পর্যন্ত, বহু ফিল্ড ট্রিপে, BNHS-এ আমি প্রচুর সময় কাটিয়েছি। দলবদ্ধভাবে দাঁড়ে ব'সে পাখিদের বিশ্রামের অভ্যেস নিয়ে ওঁর সঙ্গে গবেষণাপত্র প্রকাশ করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। একসময় উনি আমায় বলেছিলেন— বহু মানুষখেকো বাঘ আছে, কিন্তু খুব অল্পসখ্যক বাঘ-খেকো মানুষদের মধ্যে, উনিও একজন। উনি আর ওঁর সুহৃদ ও সঙ্গী ডিলান রিপ্পে খাসি পাহাড়ে বাঘ মেরে তার স্টেক খেয়েছিলেন।

সেলিম আলীর সবচেয়ে প্রিয় আসক্তি ছিল শিকার এবং মাঠে-ময়দানে পাখি সম্পর্কে বিস্তৃত চর্চা। খুব ছোটো বয়স থেকেই উনি পাখিদের সম্পর্কে খুব সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ডাইরিতে লিখে রাখতেন। বছর দশেক বয়সে এয়ারগান দিয়ে উনি একটা চড়াই পাখি মেরেছিলেন। এই ঘটনাটিই ওনাকে পাখির প্রতি উৎসাহিত ক'রে তুলেছিল। কারণ সেটা সাধারণ চড়াই ছিল না, ছিল একটা হলুদ গলা চড়াই। চড়াইটাকে উনি BNHS-এ নিয়ে যান, যে BNHS ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ, সরকারী কর্তাব্যক্তি আর চা কফি এস্টেট মালিকদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল। সেখানে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্বাবধায়করা ছিলেন ব্রিটিশ। ১৯০৬ সালে ১০ বছর বয়সে তিনি প্রথম BNHS–এর সান্নিধ্যে এলে, এই সমস্ত মানুষই তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। ধাঁচা হিসেবে BNHS হল রয়্যাল সোসাইটি অফ বার্ডস-এর মতো। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ডব্লু এইচ হাডসন। তিনি আর্জেন্টিনায় বন্য জানোয়ারদের মতো আমেরিকান ইন্ডিয়ানদেরও শিকার করতেন। হাডসনের রয়্যাল সোসাইটি অফ বার্ডস এমন একটা সোসাইটি যা সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষেই কাজ করত, যেমন BNHS কাজ করত অভিজাতদের পক্ষে।

সেলিম আলী ৩২ বছর বয়সে জার্মানীতে আরউইন স্ট্রেসম্যানের কাছে পক্ষীবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন। সেইসময় আরউইন ছিলেন বিশ্বের অন্যতম পক্ষীবিদ। ফিরে এসেই তিনি BNHS–এর জার্নালে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দু'টিতে তিনি মুঘল সম্রাটদের প্রকৃতিবিদ এবং খেলোয়াড় ওরফে শিকারি হিসেবে দেখিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে শিকারের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিচায়ক এবং স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক অবস্থায় বন্যপ্রাণীদের খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করারও ইঙ্গিতবাহী।[৫] ভারতীয় রাজপুত্ররা সবাই শিকার করতে ভালোবাসতেন। তারা যে প্রাণী ও পাখি শিকার করতেন, সেসব বন্যপ্রাণ নিয়ে তারা যথেষ্ট উৎসাহীও ছিলেন। সেলিম আলী মাইসোর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর,

হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিওর, ইন্দোর এবং ভূপাল প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিতে নিয়মিত পাখিদের সমীক্ষা করতে যেতেন রাজ পৃষ্ঠপোষকতায়। এইসব সমীক্ষার অনেকগুলিই করেছিলেন হাগ হুইসলার নামের একজন আই পি এস আধিকারিকের সঙ্গে।[৬] সেলিম আলী পাখির ট্যাক্সোনমি বা বিন্যাসবিধির মতো কাঠখোট্টা বিষয়ে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। তিনি ওয়াশিংটন ডিসি-র স্মিথসোনিয়ন ইন্সটিট্যুশনের প্রধান এস ডিলন রিপ্লের সহযোগিতায় কাজ শুরু করেন।[৭] এখন নানা অসমর্থিত কাগজপত্র থেকে প্রকাশিত হচ্ছে যে রিপ্লে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যদিও সেলিম আলী এইসব সম্ভাবনার কথা আদৌ মানতেন না। রিপ্লে দাবি করেন যে তিনি যুদ্ধের পর আমেরিকান ইন্টলিজেন্স এজেন্সির সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার প্রমাণ পেয়েছিলাম যে পানামায় অবস্থিত স্মিথসোনিয়ন ইন্সটিট্যুশনের গবেষণাগারটি বায়োলজিক্যাল যুদ্ধের গবেষণায় যুক্ত ছিল। সেটা ১৯৬৭ সাল, ভিয়েতনাম যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। যুদ্ধকালীন জৈব ও রাসায়নিক বিকারক ব্যবহারের জন্য, ভিয়েতনামের জীববৈচিত্র্যপূর্ণ বিপুল পরিমাণ অরণ্য ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা অবশ্যই দোষী। ওরা মাইলাইতে ২০ বছরের যুদ্ধে প্রচুর মানুষের হত্যা করা ছাড়াও নিরীহ মহিলা এবং শিশুদের গণহত্যা করেছিল। স্মিথসোনিয়ন-এর গবেষণা নিরক্ষীয় অঞ্চলে, তাই অবশ্যই ভিয়েতনাম যুদ্ধের সন্ত্রাসে এই সংস্থার অবদান রয়েছে। ১৯৮০-তে আমি খুবই উৎসাহ নিয়ে বেঙ্গালুরুতে ডিলন রিপ্লের একটি বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম এবং হতচকিত হয়েছিলাম। বক্তৃতায় তিনি সরাসরি ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দিকটি সেলিম আলীকে এতটুকু বিচলিত করেনি দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম।

মহারাজাগণ

সেলিম আলী ভারতবর্ষের বহু রাজ্যেই, সেইসব রাজ্যের মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষণায় বহু পাখিদের ওপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন। সকলের সঙ্গেই ওঁর বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এইসব রাজারাজড়াদের খ্যাতি ছিল শুধু নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করায় এবং ব্রিটিশ মনিবদের খুশি করায়। সাধারণ মানুষকে তারা অত পাত্তা দিতেন না বরং অভব্য আচরণ করতেন। এরমধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের আইল্যোম থিরুনল গৌরী লক্ষী বাঈ প্রজাদের জন্য খুব ভালো স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। এছাড়া বরোদার মহারাজা সায়াজি রাও গায়কোয়াড এবং কোলাপুরের শাহু মহারাজের মতো অবশ্যই কয়েকজন ন্যায়পরায়ন মানুষ ছিলেন, যারা তাদের প্রজাদের জন্য বেশ কিছু কল্যাণমূলক কাজ করেছেন। যাই হোক, এমন নিয়ম ছিল যে, মহারাজেরা তাদের রাজ্যের সাধারণ লোকের থেকে এক্কেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেন। সেলিম আলির প্রথম পাখির সমীক্ষা ছিল মহীশূর রাজ্যে। তৎকালীন মহীশূরের রাজা, জয়াচামারাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার, তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদী ক্ষমতা আর লোকালয়ে ক্ষ্যাপা হাতি অথবা মানুষখেকো বাঘের উৎপাতের সময়ে ও পরে গুলি করার জন্য প্রজাদের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর রাজপ্রাসাদের সংগ্রহে শিকার করা অনেক পশুর বিজয়স্মারক ছিল। সেলিম আলীও শিকার করতে ভালোবাসতেন, অতএব দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

এর থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আমার গুরু ভারতীয় অভিজাত এবং ইউরোপিয়ানদের বিশ্বে একজন মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব হলেও সাধারণ ভারতীয়দের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এক অর্থে তিনি নিজেও একজন মহারাজা ছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দীন ত্যাবজি-র মর্যাদাপূর্ণ ও ধনবান পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি।

ভারতীয় পাখি সম্পর্কে জ্ঞান প্রসারে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদানের কারণে এবং জনপ্রিয় বই 'Book of Indian Birds'-এর জন্য আমার বাবার মতো শহুরে শিক্ষিত ও পাখি সম্পর্কে উৎসাহী মানুষেরা তাঁর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আমার বাবার মতোই, জওহরলাল নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধী কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন এবং সকলেই পাখি দেখতে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁরা সেলিম আলিকে খুবই সম্মান করতেন এবং প্রকৃতি সংরক্ষণে তাঁর উপদেশের উপর নির্ভর করে চলতেন। আমি তাঁর সাহচর্যে বিভিন্ন ফিল্ড ট্রিপে ও জঙ্গলে গিয়ে দেখেছি যে, প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতার বিষয়টা সর্বজনবিদিত হওয়ায় সব আমলারাই তাঁকে মহারাজা জ্ঞান করতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হলেও, তিনি আদৌ গান্ধীর ভারতবর্ষকে গ্রাম স্বরাজের দেশ হিসেবে দেখার ভাবনার সমর্থক বা শরিক ছিলেন না। এই পটভূমি থেকেই বলা যায় তাঁর প্রকৃতি সংরক্ষণের উপদেশগুলি অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট, যার শিকড় রয়েছে একটি কুসংস্কারকে ভিত্তি করে, যা মনে করে যে প্রকৃতির ধ্বংসের একমাত্র কারণ হল সাধারণ জনগণ।

বন্যপ্রাণের জন্য ভারতীয় বোর্ড

স্বাধীন ভারতে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের নীতিগুলি আকার নিতে শুরু করে ১৯৫২ সালে বন্যপ্রাণের জন্য বোর্ড গঠনের মধ্যে দিয়ে। এই বোর্ডের সভাপতিত্ব করেছিলেন মাইসোরের মহারাজা এবং সহসভাপতি ছিলেন ভাবনগর রাজপরিবারের ধরম কুমার সিং। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সেলিম আলী এবং দু'জন চা-কফি প্ল্যান্টার, আর মরিস এবং ই পি গী। ই পি গী সংরক্ষিত এলাকা তৈরির জন্য সওয়াল করতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন; যা দু'দশক বাদে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।[৮] বন্যপ্রাণ আইনটির খসড়া তৈরি করেছিলেন ওয়াকেনারের রাজ পরিবারের সদস্য এম কে রঞ্জিত সিং। অর্থাৎ, যে মহারাজারা তাদের প্রজাদের সম্পর্কে আদৌ সহানুভূতিশীল ছিলেন না, সমস্ত উদ্যোগটা তারাই নিয়েছিলেন। তারা ব্রিটিশ প্রভুদের ভেট দিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়ত ছিলেন ব্রিটিশ চা-কফি এস্টেটের মালিকরা, যারা তাদের কর্মীদের ক্রীতদাসের মতো খাটাতেন।

ভরতপুরের ভুল

সেলিম আলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ— ভরতপুর জলাভূমি, স্বাধীনতার পর ১৯৫০-এর দশকে তৈরি হওয়া প্রথমদিকের অভয়ারণ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এই জলাভূমি বর্ষাকালে দলে দলে বিপুল সংখ্যার নানারকম পাখির ঝাঁক একসাথে বাসা বাঁধার জন্য এবং শীতে অসংখ্য পরিযায়ী পাখির ঝাঁকের আগমনের জন্য বিখ্যাত। উনি বহু বছর ভরতপুরে কাজ করেছেন, হাজার হাজার পরিযায়ী পাখিদের দলকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমার সৌভাগ্য যে, এইসব ভ্রমণের অনেকগুলিতেই আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। দিনের শেষে আমরা লম্বা হাঁটা দিতাম। দেখতাম বিশাল বড় বড় মোষের দলেরা ঘরে ফিরছে। সেলিম আলী ওদের দিকে ভীষণ অসন্তুষ্ট চোখে তাকাতেন আর বলতেন, "মাধব, এই বিশ্রী মোষগুলো নিষিদ্ধ হলে এই জলাভূমি পাখিদের জন্য নিরাপদ হবে।" আমি জানতাম, উনি কখনোই এদের কথা তলিয়ে ভাবেননি, এমনকি ভরতপুরের বাস্তুতন্ত্র ঠিক কীভাবে সচল থাকে, তা নিয়েও চর্চা করেননি। ওঁর ঐ মন্তব্যের পটভূমি নিছক কুসংস্কার। তবে, আমিও চুপ করে থেকেছি। ভরতপুর ছিল মোষেদের চারণভূমি।

এছাড়াও নানাভাবে জলাভূমি ব্যবহৃত হত; যেমন— বহু শতক ধ'রেই স্থানীয় মানুষ কুশ ঘাস সংগ্রহ করতেন। জলাভূমিটি এইভাবেই জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে থেকেছে। এই হল সেই জায়গা যেখানে ১৯৩৮ সালের ১২ নভেম্বর ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথো একদিনে ৪২৭২টা পাখি মেরেছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ব্রিটিশদের বন্যপ্রাণী গণহত্যার শীর্ষ স্পর্শ হয়েছিল সেদিন।

একইরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইন্টরন্যাশনল ক্রেন ফাউন্ডেশন (ক্রেন বা সারস পাখির সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা)-ও সেলিম আলীর সুপারিশগুলো সমর্থন করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে ওই স্থানীয় এলাকা ১৯৮২ সালে ন্যাশনল পার্কের তকমা পায়। ন্যাশনল পার্কের কড়া নিয়মকানুন স্থানীয় মানুষের জীবনজীবিকার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটায়। ফলে মোষচারণের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয় কোনোরকম বিকল্প ছাড়াই। প্রতিবাদ হয়েছিল। এরপর গুলিতে ৭ জন নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা বহালই রইল। এই হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফল নিয়ে এলো। জলপ্রিয় ঘাস Paspalum distichum–কে মোষ নিয়ন্ত্রণে রাখত। জলাভূমিতে পশুচারণ বন্ধ হতেই সে ঘাসের বেলাগাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল পেল্লায় কচুরিপানা। যার ফল সবচেয়ে খারাপ হয়েছিল জলের পাখিদের জন্য, যে প্রজাতিটিই নাকি ছিল ন্যাশনল পার্ক ব্যবস্থাপনার অন্যতম লক্ষ্য। উড়ে আসা সাইবেরিয়ন ক্রেন বা সারসের সংখ্যাও কমতে থাকে। এ বিষয়ে ন্যাশনল পার্কের পাশেই আঘাপুরের গ্রামবাসিরা দুর্দান্ত কৌতুহলোদ্দীপক বক্তব্য রেখেছিলেন। ওরা বিশ্বাস করেন, ক্রেনগুলো আগে ওদের প্রধান খাদ্য মাটির নীচের মূল আর কন্দের নাগাল পেত কারণ কুশ ঘাস ওপড়ানোর ফলে মাটি এমনিতেই আলগা হয়ে থাকত। ন্যাশনল পার্ক ঘোষণা হতেই কুশ সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে মাটি জমাট বেঁধে থাকত আর সারসরা তাদের প্রিয় খাবারের নাগাল পেত না। এই সম্ভাবনাময় অনুমানটি সম্পর্কে পরবর্তী অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, বিষয়টা অপরীক্ষিতই রয়ে গেল, কারণ ন্যাশনল পার্ক কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞানে কোনো উৎসাহ ছিল না। BNHS এইসব ক্ষতিকারক ফলাফল নিয়ে চর্চা করে এবং US FISH AND WILDLIFE SERVICE–কে একটা রিপোর্ট জমা দেয়। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কখনোই কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক জার্নালে প্রকাশ করেনি, পাছে দায় নিতে হয়।[৯]

বন্যপ্রাণ আইন

সেলিম আলী, তাঁর চা-কফি এস্টেট মালিক বন্ধুরা এবং মহারাজারা বন্যপ্রাণ আইন (Wildlife Protection Act)-এর প্রবক্তা। আইনটার মধ্যে দিয়ে সারা ভারতবর্ষ বন দপ্তরের অত্যাচারী থাবার ভেতর প্রবেশ করেছিল।[১০] যে শিকারকে এই আইন অপরাধ ব'লে ঘোষণা করে তা আসলে মানবতার ঐতিহ্যের অংশ। ৩ লক্ষ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকার সাভানার মানুষ আবির্ভূত হয়েছিল শিকারি গোষ্ঠী হিসেবে। আজ পর্যন্ত শিকার করা মাংসই পুষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে থেকেছে এযাবতকালের বিবর্তনের ইতিহাসে। পার্থক্য এটুকুই যে আফ্রিকায় মানুষ বুশমিট (ঝোপঝাড় থেকে শিকার করা বন্যপ্রাণীর মাংস) খায় আর স্যুইডিশরা, নরওয়েবাসীরা খায় মুজ নামের হরিণ। একমাত্র আধুনিক ভারতবর্ষ বাদে সর্বত্র শিকার সিদ্ধ। মাংসের জন্য না হলে, বিনোদনের জন্য; এখনো। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিগত উত্থানের প্রচেষ্টা সমস্ত গোষ্ঠীবদ্ধ স্তন্যপায়ীর মধ্যেই দেখা যায়, আমাদের প্রজাতির মধ্যেও। শিকারের সময় সাহস দেখানো এবং শিকারের নানা কৃতকৌশল গোষ্ঠী বা সমষ্টির অন্যান্য সদস্যদের কাছে মূল্য পায় এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসে ব্যক্তির উত্থানের পথ সুগম করে। আনন্দদায়ক শিকার একজন মানুষকে শিকারের উন্নততর কৃতকৌশল শেখায় এবং

তার সাহস বাড়ায়। সেজন্যই শিকার মানুষের কাছে একটা বিনোদনমূলক অভিজ্ঞতা হিসেবেই বিবর্তিত হয়েছে। ভারতবর্ষে শিকারের খুবই রেওয়াজ ছিল ১৯৫০-এর দশকেও, তখন আমি স্কুলছাত্র। এমন অনেককেই চিনতাম যারা তাদের মৃগয়া নিয়ে আনন্দ আর অহঙ্কার প্রদর্শন করতেন। নিজেদের দক্ষ ও সাহসী শিকারি হওয়ার দাবির সমর্থনে তাঁরা তাদের পশু-স্মারক দেখাতেন, ছবি দেখাতেন। সাধারণত, ছবিগুলোয় শিকার করা প্রাণীর শরীরের উপর একটা পা রেখে দাঁড়ানো। আমার একজন কাকা ছিলেন, যিনি ইন্ডিয়ন সিভিল সার্ভিস-এ যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিলাসবহুল বাংলোর সমস্ত ঘরেই ইতিউতি ছড়ানো থাকত বাঘের চামড়া। বেশ আপ্লুত স্বরেই তিনি আমায় সেইসব শিকারের গল্প করেছেন সমগ্র জীবনকালে, বিশেষ করে চিতা এবং অন্যান্য বাঘের। সেলিম আলীর মুম্বাই-এর পালি হিল-এর বাংলোতেও একটা চিতাবাঘের চামড়া আছে। সেলিম আলীর বহু মহারাজা বন্ধুরই ব্যক্তিগত সংরক্ষিত ক্রীড়াঙ্গন ছিল যেখানে শুধুমাত্র তাদের এবং তাদের অতিথিদের জন্য শিকার সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭২ পর্যন্ত বহু মহারাজাই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করেছেন তাদের সংরক্ষিত ক্রীড়াঙ্গনে অতিথি হিসেবে ইউরোপিয় পর্যটকদের শিকার করতে দিয়ে।

জীবন-জীবিকা ধ্বংস

ব্রিটেনে যেমন সামন্ত প্রভুরা সারা দেশের সমস্ত জমিই দখল করে রেখেছিল, ভারতের ক্ষেত্রে অবস্থা তেমন ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলোর সংরক্ষিত জল এবং জমি ভারতের মোট ভূখন্ডের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। পর্যাপ্ত জায়গা উন্মুক্তই থাকত, এমনকি মানুষের বসতির কাছাকাছিও অসংখ্য বন্যপ্রাণী ঘুরে বেড়াত এবং অভিজাত এবং সাধারণ উভয় ধরণের মানুষই তাদের শিকার করতেন। বন্যজন্তুদের প্রাচুর্য অব্যাহত ছিল রাজাদের সংরক্ষিত ক্রীড়াঙ্গনে এবং তার বাইরেও। এর একটা কারণ বন্দুকের অপ্রতুলতা হলেও, তাদের বিচক্ষণতার ঐতিহ্যও একটা অন্যতম কারণ। সমকালীন বাস্তুতান্ত্রিক তত্ত্ব দেখিয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটি প্রজাতির সংখ্যার "প্রজননশীল মূল্য" বেশি থাকে। ঐ পর্যায়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবার কারণেই প্রজাতিটি বিপুল সংখ্যায় টিকে থাকতে পেরেছে। গর্ভবতী ও বাসা-বানানো পাখিরা এই পর্যায়টির উদাহরণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— Phasepardhis নামক যাযাবর শিকারি জনজাতিরা (মূলত মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশবাসী) তাদের ফাঁদে পড়া কোনো গর্ভবতী হরিণকেই রেহাই দিত না। অথচ ভারতের বিভিন্ন অংশেই পরম্পরাগতভাবেই সারস জাতীয় পাখিদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিরাপত্তা দেওয়া হত প্রজনন ঋতুতে। এইরকম অনেক পেশাদার শিকারি-সংগ্রাহক সম্প্রদায়, কৃষকদের সঙ্গে একধরণের বোঝাপড়া রেখে চলত। তারা চাষিদের ফসল ধ্বংসকারী পোকা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করত। উত্তর ভারতের বহেলিয়া এরকম এক জনজাতি। ১৮৫৭ সালে সাতনায়, পিন্দ্রা গ্রামে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহেলিয়াদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। ১৮৫৭-র পর ব্রিটিশরা এই ধরণের সম্প্রদায়ের ওপর প্রতিশোধ নেবে ব'লে মনস্থির করে। সেই অনুযায়ী ১৮৭১ থেকে নানারকম ফৌজদারি আইন চালু হল ক্রিমিনাল ট্রাইব্স অ্যাক্টের আধারে। এই আইনগুলোর ন্যায্যতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিক জে এফ স্টিফেন বলেন, "পেশাদার অপরাধীদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, আমরা মনে করছি যে জনজাতির পূর্বপুরুষেরা অপরাধী ছিল স্মরণাতীতকাল থেকে। তারা তাদের জাতকে ব্যবহার করত অপরাধ করার জন্য। সেই জাতিগুলোর উত্তরপুরুষেরাও একইভাবে আইনের চোখে অপরাধী হবে, যতদিন না সম্পূর্ণ জাতিটা নির্মূল হয়ে যাচ্ছে।"[১১] ১৯৩৬ সালে জওহরলাল

নেহেরু এই আইনটার নিন্দা করে বলেছিলেন, "এই আইনে যে দানবীয় বিধান রয়েছে তা মানুষের নাগরিক স্বাধিকারকেই নাকচ করে। কোনো জনজাতিকে এভাবে অপরাধী বলা যায় না। কোনো সভ্য নীতির সঙ্গে এই বক্তব্য আদৌ সাযুজ্যপূর্ণ নয়।" ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময়ে, কোনো সম্প্রদায়ের কোনো একজন সদস্যকেও নির্ধারিত এলাকার বাইরে দেখা গেলেই তল্লাশি ও গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হতে হতো। এভাবেই ১২৭টি সম্প্রদায়ের ১.৩ কোটি মানুষ খানাতল্লাশির আওতাভুক্ত ও গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে এই আইন বাতিল করা হয়। আগেকার 'ক্রিমিনাল ট্রাইব' বিনথিভুক্ত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। তবে, তাদেরকে অধীনস্ত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই সরকার নিয়ে এলেন Habitual Offenders Act 1952। যার অর্থ স্বভাবসিদ্ধ অপরাধী আইন, ১৯৫২। এখন ভারতবর্ষে ৩১৩-টা যাযাবর জনজাতি রয়েছে যাদের বেশিরভাগকেই অপরাধী জনজাতি হবার তকমা উত্তারাধিকার সূত্রে আজো তাড়া করে চলেছে। তার সঙ্গে চলেছে নিরন্তর বিচ্ছিন্নতা আর পুলিশ, গণমাধ্যম, বনদপ্তর এবং শহুরে সংরক্ষণবাদীদের দেওয়া অদ্ভুত অপরাধী দুর্নাম। মাদারিদের মতো একটা বিনোদিনী সম্প্রদায় বাঁদরদের নিজেদের বেশ আয়ত্তে রেখেছিল এবং তাদের কান্ডকারখানা ছোট বয়সে আমার ও আমার বন্ধুদের বেশ আনন্দ দিত। WLPA–এর মধ্যে দিয়ে, কলমের একটা আঁচড়ে, নিতান্ত বোকার মতোই এইরকম অজস্র মানুষের জীবিকা শুধু কেড়েই নেওয়া হল না, সন্তোষজনক এবং বিকল্প জীবিকার কথা ভাবাও হলনা। এই পদক্ষেপ হল আসলে ইচ্ছাকৃতভাবে এই মানুষদের ধীরে ধীরে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দেওয়া। এর তুলনা করা চলে একমাত্র সেইসব ব্রিটিশ প্ল্যান্টারদের সঙ্গে যারা ১৮৬০-এ স্থানান্তরী কৃষি নিষিদ্ধ করতে চাপ দিয়েছিল প্রায় ক্রীতদাসত্বের শর্তে তাদের বাগানে মজুরদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য।

অধীনতা

এটা কোনো সমাপতন নয় যে WLPA-তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই, এমনি এমনিই সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার মূল্যে হওয়া ধ্বংসাত্মক উন্নয়নের বিরুদ্ধে গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল, যার জলজ্যান্ত প্রমাণ চিপকো আন্দোলন। এই আইনটা বনদপ্তরের ক্ষমতা অসম্ভব বাড়িয়ে তুলেছিল। আইনটার আগে, বনদপ্তরের চৌহদ্দি সীমিত ছিল শুধুমাত্র সেইটুকু জমিতেই যেটুকু 'জঙ্গলের জমি' হিসেবে স্বীকৃত, নথিভুক্ত ছিল; তাও ভারতের মোট ভূখন্ডের প্রায় ২৩%। WLPA সেটাকে সারা ভারতে প্রসারিত করেছে। যেহেতু বহু সহস্রাব্দ ধ'রেই ভারতের একটা বড় অংশের গ্রামবাসিরা এবং বনবাসিরা প্রোটিনের প্রয়োজনে এবং ফসলের নিরাপত্তার জন্য পশুশিকার করত, WLPA এদেরকে অপরাধী প্রতিপন্ন করতে ক্রিমিনাল ট্রাইব আইনকেও ছাপিয়ে গেছে। ভারতের আইনটা বিশেষ; অন্যান্য দেশের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনগুলো তাদের জাতীয় উদ্যান, সংরক্ষিত অরণ্য ব্যবস্থাপনা বা অন্য সবকিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে, দেশের বাকি অঞ্চল এসব আইনের চৌহদ্দির বাইরেই থাকে। অন্যান্য বহু পার্থক্য সত্ত্বেও এমনটাই ঘটে কেনিয়া বা আমেরিকায়। কেনিয়ার মানুষ ব্যাপকভাবেই তথাকথিত 'বুশমিট' খায় এবং তাই নিয়ে তাদের আইন খুব একটা নাক গলায় না। আমেরিকার মানুষ সংরক্ষিত এলাকার বাইরে একটা 'মৃগয়া অনুমতি'র বিনিময়ে শিকার করতে পারতেন।

চিপকোর আন্দোলনকারীরা প্রাথমিকভাবে গাছ কাটা আটকাতে সফল হয়েছিলেন গাড়োয়াল অঞ্চলে। গোপেশ্বরের দাশোলি গ্রাম স্বরাজ্য মন্ডল, যারা এই প্রতিবাদে বেশ ভালোরকম জুড়ে ছিলেন, পরবর্তীতে তাঁরা গঠনগত কার্যক্রম হিসেবে একটি ধারাবাহিক প্রকৃতি-উন্নয়ন ক্যাম্প

শুরু করেন গাড়োয়ালের অলকানন্দা উপত্যকায়। এর মধ্যে একটিতে আমি ১৯৮১ সালে যোগ দিয়েছিলাম। দেখেছিলাম সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামাবাসিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাটি আর জলের সংরক্ষণের কাজ করছে, পাথরের বেড়া দিচ্ছে, স্থানীয় মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ গাছের চারা লাগানোর কাজে হাত লাগাচ্ছে। ১৯৮০-র দশকে এই সাধারণ মানুষদের বৃক্ষরোপণ এবং তার আশেপাশের জমিতে বনদপ্তরের করা প্ল্যান্টেশানের মধ্যে তুলনামূলক মূল্যায়ণ করা হয়েছিল। আহমেদাবাদের Space Application Center, স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি এনেছিল। আমি এবং এস নরেন্দ্র প্রসাদ এ বিষয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলাম। মানুষের বৃক্ষরোপণ অনেক অনেক বেশি সফল হয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম যে মানুষের করা বৃক্ষরোপণে ৮০% চারা বেঁচেছিল, যেখানে বনদপ্তরের প্ল্যান্টেশানে চারা বেঁচেছিল ২০%।

তাই, ধ্বংসাত্মক উন্নয়ন বাহিনীর মুখ্য নিশানা হয়ে পড়ে চিপকো আন্দোলন এবং তার বন পঞ্চায়েতগুলো। বনদপ্তর চিপকো আন্দোলনের নেতৃত্বদের হেনস্থা করতেই থেকেছে, লতা-রেনি গ্রাম থেকে গৌরা দেবীকেও হেনস্থা করেছে। এস নরেন্দ্র প্রসাদ, যিনি আগে এইসব প্রকৃতি উন্নয়ন ক্যাম্পগুলোর স্বেচ্ছাসেবকদের অসাধারণ কর্মকান্ডের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, উনি আবার এক দশক পরে সেই লোকালয়গুলিতে ফিরে যান। উনি জানান যে বনদপ্তরের অন্তর্ঘাতের কারণে ঐ অঞ্চলগুলোতে গোরাল (এক ধরণের ছাগল) এবং অন্যান্য জাবর-কাটা-প্রাণীদের বাসস্থানের ক্রমাবনতি হয়েছে। এইরকম ধ্বংসলীলা চলতে থাকলে মর্মান্তিক ফলাফলগুলোও চলতেই থাকবে। যেমন আমরা দেখেছি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে চামোলিতে ভয়ংকর ধস নেমেছিল। যে ধসে বন্যায় ভেসে গিয়েছিল গোটা চামোলি জেলা এবং মারা গিয়েছিল ২০৪ জন মানুষ।

প্রকৃতিনির্ভর পর্যটন

ব্রিটিশ অভিজাতদের নেতৃত্বে, ওয়র্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের প্ররোচনায় এবং বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে WLPA-র প্রচারের সমান্তরালে প্রজেক্ট টাইগার বা ব্যাঘ্র প্রকল্প শুরু হল। তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে প্রকৃতিনির্ভর পর্যটনের লক্ষ্য ছিল পশ্চিমী বাণিজ্যিক স্বার্থে ফটোগ্রাফি, টেলিভিশন এবং আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রার প্রসারের বন্দোবস্ত করা। দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব সাভানা এবং ভারতের পর্ণমোচী অরণ্য বন্যপ্রাণসম্বলিত অবস্থায় দেখার ক্ষেত্রে দারুণ সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। দক্ষিণ আমেরিকা বা পশ্চিম আফ্রিকার বৃষ্টি অরণ্য (রেইন ফরেস্ট) বন্যপ্রাণ দেখার উপযুক্ত ছিল না। এগুলি খনির জন্য নষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়াও ইউরোপ এবং আমেরিকায় মাংস যোগান দেবার জন্য গবাদি পশুর খামার তৈরি করতে ধ্বংস করা হয়েছে। আর ভারতের সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্পের অঞ্চলগুলি WLPA, ১৯৭২ দ্বারা সমর্থিত। এগুলি কেনিয়ার মাসাই মারা সংরক্ষিত ক্রীড়াঙ্গনের আদলে তৈরি করা হয়েছে। আমি ১৯৭১ সালে মাসাই মারায় গিয়েছিলাম। ইউরোপীয় পর্যটকদের যত্নআত্তির লক্ষ্যেই ব্যবস্থাপনায় ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র দাপট প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ২০১৯ সালে, আমার বন্ধু বিজয় এদলাবদকর মাসাই মারায় গিয়েছিলেন। ইউরোপীয় পর্যটন সংস্থার হয়ে কাজ করে এমন একজন ভারতীয় এজেন্টের মাধ্যমেই উনি সমস্ত বুকিং করেছিলেন। ওঁর গোটা পর্যটনটাই খুব কড়াভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল পর্যটন সংস্থাটির দ্বারা। ওঁর মনে হয়েছিল যানচালক ছাড়া আর একজনও স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যাতে কথা বলার কোনো সুযোগ উনি না পান, সেটা নিশ্চিত করতেই এই কড়াকড়ি। আমার বন্ধু রাস্তার ধারের ফেরিওয়ালার থেকে সামান্য অলঙ্কার কিনতে

চাইলে ড্রাইভার সেখানেও থামতে অস্বীকার করে। হোটেলের ভেতর কার্যত তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয় প্রহরী সমেত। সেই প্রহরী হোটেলের বাইরে বাজারে যাবার জন্যও দরজা খুলে দিতে অস্বীকার করে। সংরক্ষিত ক্রীড়াঙ্গনের গা ঘেঁষা একটা বিপুল পরিমাণ জমির মালিক হল ঐ ইউরোপীয় পর্যটন সংস্থা। পার্কের ভিতরের সমস্ত পর্যটনই সম্পূর্ণভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। রীতিমতো উদ্যোগ নিয়ে স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে যাবার কারণ হয়তো, স্থানীয় মানুষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। এই পার্কের নাম মাসাই-এর মানুষদের নামে হলেও, রিজার্ভটি স্থাপন করার জন্য এই এলাকার প্রকৃত পূর্বপুরুষ, মাসাইদের জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাদের দেশজ জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। আফ্রিকার অন্য দেশগুলিতে ক্রীড়া খামার রয়েছে, যেমন বারকিনা ফাসোতে নাজিংগা ক্রীড়া খামার।[১২] আবারও এই ক্রীড়া খামারগুলোর মালিক এবং পরিচালক ইউরোপীয়রাই। এই ক্রীড়া খামারগুলোতে পর্যটকরা হাতি ও অন্যান্য প্রাণী শিকার করতে পারে এবং শিকার-স্মারক নিয়ে ব্রিট্রেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে ফিরে যায়। ২০০৫ থেকে ২০১৪–এই ১০ বছরে তুষার হংস বা স্নো গুজ থেকে শুরু ক'রে আমেরিকার কালো ভাল্লুক থেকে সিংহ, হাতি, গন্ডার, ইম্পালা এবং হরিণ মেরে স্মারক-শিকারিরা কানাডা এবং আফ্রিকা থেকে ১২.৬ লক্ষ শিকার-স্মারক আমদানি করেছে আমেরিকায়। এটাই ব্রিটেনেও চলে, তবে আমেরিকার চেয়ে কম মাত্রায়। অতএব ১৯৭২ থেকে ভারতে যখন সমস্ত বন্য পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের শিকার নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন ব্রিটেন বা আমেরিকায় কিন্তু কোনো সংযম বা নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়নি।

WLPA ন্যাশনল পার্কের যে ধাঁচা দিয়েছিল, তা আদতে আমেরিকার ন্যাশনল পার্কের মডেল। আমেরিকার ন্যাশনল পার্কের ইতিহাস বেশ শিক্ষণীয়। ইউরোপ থেকে উত্তর আমেকিয়ার আসা বসতি স্থাপকেরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে এসেছিলেন, তারা জঙ্গল ধ্বংস করেছিলেন এবং অসংখ্য বন্যজন্তুদের স্রেফ মুছে ফেলেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে লাখ লাখ বাইসন এবং কোটি কোটি যাত্রী পায়রা বা প্যাসেঞ্জার পিজয়ন। এই মহাদেশে ইউরোপীদের বিজয়যাত্রা শেষ হবার পর দেশীয় মানুষদের সামান্য কিছু সংরক্ষিত অঞ্চলে ঠেলে দেওয়া হল। তখনই, বন্যতার সৌন্দর্য্য সম্পর্কে ইউরোপীয়দের চোখ খুলে গেল, তারা সচেতন হল। এই উদ্বেগ থেকেই ইয়লোস্টোন এবং অন্যান্য ন্যাশনল পার্কের প্রতিষ্ঠা। দাবি করা হলেও আমেরিকার ইয়লোস্টোন কিন্তু পৃথিবীর প্রথম সংরক্ষিত অরণ্য নয়। এই মুকুটটির অধিকারী মঙ্গোলিয়ার বোগ খান পর্বত, যাকে প্রাথমিকভাবে সেখানকার মানুষ এবং তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সেখানকার সরকার পবিত্র পর্বত হিসেবে সংরক্ষিত ক'রে আসছেন। ভারতেরও বেশ কয়েকটি পবিত্র পর্বত রয়েছে, যেমন কেরালার শবরীমালা, কর্ণাটকের গোপালস্বামী বেট্টা, হিমালয়ের বদ্রীনাথ। কিন্তু কোনো শাসকই এগুলিকে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি।

সংরক্ষণের প্রতিমূর্তি বাঘ

যে বাঘকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক মুনাফাসহ দিব্যি আনন্দে ফুর্তিতে শিকার করত ধনী ও ক্ষমতাশালীরা, বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার পর হঠাৎ করেই অন্য আরেক গুচ্ছ ধনী এবং ক্ষমতাশালী মানুষদের প্রকৃতিভিত্তিক, বাঘকেন্দ্রিক মুনাফার জন্য সেই বাঘকেই সংরক্ষণের প্রতিমূর্তি (আইকন)-তে পরিণত করা হল। যারা বাঘকে শিকারে রূপান্তরিত প্রাণী হয়ে যাওয়া থেকে যে কোনো মূল্যে সংরক্ষণের প্রতিমূর্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটির বেশ প্রভাবশালী

সসদ্য এবং ওয়র্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ (ইন্ডিয়া) ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অ্যান রাইট। অ্যান ছিলেন সেই রাইট পরিবারের সদস্য, যারা কলকাতায় পদার্পণ করেছিল ব্রিটিশদের সিভিল সার্ভিস এবং ভারতীয় পুলিশ বিভাগে কাজ করার জন্য। মনে রাখতে হবে, এই পরিবারের সদস্যদের সকলেই ব্রিটেনের নাগরিকত্ব বজায় রেখেছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকেও তারা লোভাতুর শিকারি ছিলেন, তারপর থেকে তারা এদেশের সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণের থেকে কীভাবে অন্যান্য সুযোগসুবিধা নেওয়া যায়, তা ভাবতে শুরু করেন। এই রাইট পরিবার দু'টি খুব মুনাফাদায়ী রিসর্ট-এর পরিচালক যার একটি কানহায় এবং অন্যটি সুন্দরবনের সংরক্ষিত অরণ্যে। রাইটরা কানহা অরণ্যের লাগোয়া রিসর্টটার নাম রেখেছেন কিপ্লিং ক্যাম্প। সেই অনবদ্য লেখক রাডিয়ার্ড কিপ্লিং যিনি একইসঙ্গে যেমন ভীষণ বর্ণবাদী ছিলেন, তেমনই আবার জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডকে সমর্থন করেছিলেন। ব্যাঘ্র সংরক্ষিত অরণ্য ছিল একেবারেই ওয়র্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফাউন্ডেশনের মস্তিষ্কপ্রসূত। প্রিন্স ফিলিপ, রানী এলিজাবেথের স্বামী ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। তাই, রাইট পরিবারের অনেকেই অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়র-এর মতো সম্মান পেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শিকারে ব্রিটিশদের অধিকার অক্ষুণ্ন

আত্মবিস্মৃত ভারতীয়রা যখন তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের সুতোর টানে নেচে নিজেদের দেশে শিকার নিষিদ্ধ করছিল, সেইসময় থেকে আজ অবধি ব্রিটেনে বহু বহু শুটিং এস্টেট রমরমিয়ে চলেছে এবং তাদের বন্যপ্রাণী, বিশেষ করে পাখি শেষ হয়ে চলেছে। ব্যক্তিগত জমিমালিকরা পশুপালক বা শিকারভূমির রক্ষক নিযুক্ত করতেন পোচিং আটকানোর জন্য এবং common pheasants, French partridge ইত্যাদি সব পাখি প্রতিপালনের জন্য, wild red grouse-দের সামলানোর জন্য এবং র্যাপ্টারদের মতো শিকারিদের প্রতিরোধ করার জন্য। এই শিকারি পাখিদের নিয়ন্ত্রণের ফলে গত ২০০ বছর ধ'রে বেশ কিছু শিকারি পাখির প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যেমন— White-tailed eagle, Red kite, Western marsh harrier, Osprey and Northern goshawk–এর মতো প্রজাতিগুলি। প্রতিদিন ইংল্যান্ডে ১২,৩০০ বন্য স্তন্যপায়ী এবং পাখি মারা পড়ে সেদেশের শুটিং এস্টেটগুলিতে, যেখানে ধ্বংসলীলার মূল কান্ডারিদের অন্যতম হল পশুরক্ষকরা।

সারিস্কা

ভারতের শহুরে শিক্ষিতরা পশ্চিমে তৈরি হওয়া এইসব খামখেয়ালিপনায় যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাঘ সবসময়ই পশ্চিমীদের অভিভূত করেছে; ১৭৯৪-এ উইলিয়াম ব্লেকের কবিতার পংক্তি "Tyger Tyger, burning bright,/ In the forests of the night;/ What immortal hand or eye,/ Could frame thy fearful symmetry?" থেকেই তা স্পষ্ট। পশ্চিমে, বাঘকেন্দ্রিক প্রকৃতি-পর্যটন এখন বেশ কেতাদুরস্ত বিষয়। ভারতের ধনী শহুরেরাও আজকাল এটির সুযোগ নিচ্ছেন, উপভোগ করছেন। সারিস্কা টাইগার রিজার্ভ, যা নাকি আগে আলওয়ারের মহারাজাদের মৃগয়াক্ষেত্র ছিল, এখন পশ্চিমী এবং ভারতীয়দের খুব প্রিয় একটা পর্যটনকেন্দ্র। আমি ২০০৫ সালে সেখানে গিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রীর তৈরি টাইগার টাস্ক ফোর্সের একজন সদস্য হিসেবে। এই টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছিল কারণ কয়েক বছর যাবৎ সেখানে

বাঘের দেখা পাওয়া যায়নি, এমনকি পায়ের ছাপ বা কণ্ঠস্বর-এর মতো বাঘের উপস্থিতির কোনো পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছিল না। রাজস্থান বনদপ্তর বুঝিয়েছিল যে "এখন বাঘেরা সাময়িকভাবে সংরক্ষিত এলাকার বাইরে পরিযানে গেছে, কিন্তু বর্ষার পরেই তারা ফিরে আসবে।" প্রজেক্ট টাইগার কর্তৃপক্ষও এই ধারণাকে সমর্থন করেছিল। টাস্ক ফোর্স সারিস্কাতে যখন মিটিঙে বসেছে, বাকি সদস্যরা বনদপ্তরের আতিথেয়তায় লজে পানভোজনেই ব্যস্ত ছিলেন। শুধু আমি এবং সুনীতা নারেন, টাস্ক ফোর্সের সভাপতি বনকর্মীদের সঙ্গে কথা বলি। কারণ তাঁরাই ঠিক মতো বলতে পারতেন যে বাস্তবে ঠিক কী ঘটে চলেছে। বনকর্মীরা তাদের ফিল্ড ডাইরি বের করেন এবং এতগুলো বছরে সেখানকার এন্ট্রিগুলো আমাদের দেখান। তারা খুব ভালোভাবেই জানতেন যে ১৯৯৯ থেকে বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে এবং ২০০২-তে আর একটি বাঘও অবশিষ্ট ছিল না।

সাল	১৯৯৮	'৯৯	২০০০	'০১	'০২	'০৩	'০৪
সরকারি সমীক্ষা	২৪	২৬	২৬	২৬	২৭	২৬	১৭
স্টাফদের দেখা	১৭	৬	৫	৩	০	১	০

কিন্তু তাদের ওপরওয়ালারা সকলকে ঠকাচ্ছে এবং দাবি করছে যে ২০০২ সাল পর্যন্ত নাকি ২৭-টা বাঘ সারিস্কার চারপাশে ঘুরে বেড়াত। একই সময়ে ভারতের ইন্টিলজেন্স এজেন্সি, সিবিআই-কে একটা তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সিবিআই দু'মাসের মধ্যে তাদের তদন্তের রিপোর্টে জানায় যে সেখানে আর কোনো বাঘ অবশিষ্ট নেই। বাঘের নিরুদ্দেশের জন্য পোচিং-কে দায়ী করা হয়। কিন্তু এই পোচার কারা? রেকর্ড বহির্ভূতভাবে সিবিআই এই টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে কথা বলে। আমাদের জানায় যে বনবিভাগের আধিকারিকরা যে এই পোচিং-এ যুক্ত তা নিয়ে কোনো সংশয়ই থাকতে পারে না। পুতিগন্ধময় বাঘের চামড়াসুদ্ধ মৃতদেহ দিনের পর দিন ফেলে রাখা হত। এই মৃতদেহগুলো অফিসারদের চোখে পড়েনি এমনটা হওয়া কার্যত অসম্ভব। নিঃসন্দেহে তারা পোচিং চক্রের সঙ্গে যুক্ত। যাইহোক, এই পর্যবেক্ষণগুলো আমরা আমাদের টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে রাখতে পারিনি। বাস্তবে কিন্তু পোচিং-এর অভিযোগে আমলারা আশপাশের বহু গ্রাম থেকে বহু গ্রামবাসীকে ধরপাকড় করেছে, পিটিয়েছে। কিন্তু অবশ্যই এর জন্য কোনোদিনই কোনো আমলাকে দায়ী করা হয়নি।

সংরক্ষণ সংস্কৃতিবিদদের ছদ্মবিজ্ঞান

সেলিম আলীর ভরতপুরের ভুল থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে উনি একজন মহান প্রকৃতিবিদ, পাখি বিশেষজ্ঞ হলেও, পাখিদের জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি পুঙ্খাপুঙ্খ তাঁর জানা থাকলেও বাস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞান এবং ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল যৎসামান্যই । বাস্তুতন্ত্রে এমন অনেক জটিল ব্যবস্থা জুড়ে থাকে, যা স্থান-কালের নিরিখে বিচিত্র, বিভিন্ন। যা কিনা তার ইতিহাস দিয়ে শর্তবদ্ধ। বাস্তুতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে, যে কোনো পশুচারণ বা মোষচারণ অনভিপ্রেত— এই সাধারণীকরণটি অবান্তর। প্রত্যেকটা বিশেষ ক্ষেত্রকে আলাদা ক'রে, তার নিজের গুরুত্বেই তাকে বিচার করতে হবে। ভরতপুরে দীর্ঘ ২৫০ বছর ধ'রে পশুচারণ চলা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক জলের পাখি বেঁচে আছে। তাই পশুচারণ বন্ধ হলে জলাভূমিটির সেই জলের পাখিদের উন্নত আবাসস্থল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। যদি কেউ এই বন্দোবস্তটিকে একটি কেজো অনুমান হিসেবে ধ'রে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার কার্যকারিতা যাচাই করতে চাইত, তবে জলাভূমির একটা অংশে পশুচারণ বন্ধ ক'রে দেখা যেতে পারত। তারপর ফলাফলের দিকে নজর দিয়ে পশুচারণভূমি বাড়ানো বা কমানো যেতে পারত। আদৌ এসব কিছুই ভাবা হয়নি। যতদূর জানি, সেলিম আলী কোনোদিন কোনোরকম বিবেচনা ছাড়াই ওই সমগ্র অঞ্চলে চিরকালের জন্য পশুচারণ বন্ধ হওয়ার ফলে যেসব মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল, তার জন্য কখনোই কোনোরকম শোক প্রকাশ করেননি।

সেলিম আলী এক দুর্দান্ত মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তিনি একজন কাল্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিলেন শহরভিত্তিক প্রকৃতি-সংরক্ষণ কর্মীরা। এই 'প্রথমে বন্যপ্রাণ'-বাদীরা কোনোরকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়াই বাস্তুতান্ত্রিক পরিভাষার জাল বুনে চলত। আমাদের এই বিশাল দেশে বাস্তুতন্ত্রও বহুরকম; হিমালয়ের উঁচু পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র যেমন রয়েছে তেমনই আন্দামান ও লাক্ষাদ্বীপের প্রবাল প্রাচীরও রয়েছে। এর নদীর মধ্যেও যেমন গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র-র মতো বিশাল নদী রয়েছে, তেমনই পশ্চিম উপকূলে রয়েছে বশিষ্ঠি, কালি, মান্ডবী এবং পেরিয়ারের মতো ছোট ছোটো নদী। আমাদের একটা বিপুল পরিমাণ জমিতে কৃষিকাজ করা হয় কোথাও সেচখাল, কোথাও নদীর সেচে কোথাও বা সম্পূর্ণত বৃষ্টির জলে। এই দেশের ভূপৃষ্ঠের ওপর ক্রমশ বেড়েই চলেছে কংক্রিটের জঙ্গল। রাস্তা ও হাইওয়ের অন্তর্জালও ক্রমবর্ধমান। সমস্ত জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ নিয়ে ভাবতে গেলে এই সমস্ত কিছুর দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এমনকি শুধু বাঘ হাতি বা গন্ডার প্রভৃতির মতো বিশেষ প্রজাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি। শহুরে সংরক্ষণবাদীরা এই ব্যবস্থাকেই অস্বীকার করে, তারা শুধুমাত্র অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্র করেই ভাবে। কিন্তু নদীতীরবর্তী বাস্তুতন্ত্র বনবাস্তুতন্ত্রের চেয়ে আরো অনেক বেশি বিপদগ্রস্ত। তবুও সেই বাস্তুতন্ত্রটিও ঘড়িয়াল বা গাঙ্গেয় ডলফিনকে অনেকটা সহায়তা দিয়ে চলেছে।

সংরক্ষণ মূল্য

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এই প্রশ্ন ওঠা উচিত যে ঘড়িয়াল বা বাঘ বা হাতি সংরক্ষণের আপেক্ষিক মূল্য কী। রঞ্জিত ড্যানিয়ল এবং আমি এই কাজটা করার জন্য একটা কাঠামো তৈরি করি।[১৩] কোনো প্রজাতির সংরক্ষণ মূল্য নির্ভর করে (১) যে বাস্তুতন্ত্রে প্রজাতিটির বসত, তার সঙ্কটের পর্যায়টি ঠিক কী (২) এর ভৌগোলিক বিন্যাসটি ঠিক কেমন (৩) এদের পছন্দের

বাসস্থানের পরিসর (৪) তার ট্যাক্সোনমিক বা বিন্যাসবিধিগত অবস্থানের অনন্যতা এবং (৫) সংকটের মাত্রা-র ওপর। এই কাঠামোয় সব দিক থেকেই ঘড়িয়াল, হাতি বা বাঘ উভয়ের চেয়েই অনেক বেশি মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছে। (১) ঘড়িয়ালকে দেখা যায় মিষ্টি জলে এবং তা বাঘ বা হাতির মতো জঙ্গলের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি বিপন্ন। (২) ঘড়িয়াল গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মতো মাত্র কয়েকটি নদী উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ। অথচ বাঘ, হাতি প্রভৃতি প্রাণী অনেক বড় এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। বেশ কিছু দেশেও দেখা যায়। (৩) ঘড়িয়ালের পছন্দের আবাসস্থল বেশ সংকীর্ণ; আর বাঘ বিপুল জঙ্গলাকীর্ণ যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। হাতি আবার যেমন নানা বৈচিত্র্যময় জঙ্গলে থাকতে পারে বা ঝোপঝাড়ে থাকতে পারে, তেমনই আবার চাষজমিতেও হানা দেয়। (৪) বাঘ বা হাতির তুলনায় ঘড়িয়ালের প্রজাতিসংখ্যা (taxa) অনেক কম। (৫) ঘড়িয়ালের সংখ্যা ১৯৪৬-এ ১০,০০০ থেকে ২০০৬-এ ২৫০-এর থেকেও কমে গেছে, যেখানে বাঘ এবং হাতির সংখ্যা যথেষ্ট বেশি এবং ক্রমবর্ধমান। তবুও আমরা এই দুই প্রজাতিকে নিয়ে আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।

জীববৈচিত্র্যের সঙ্কট

ঘড়িয়ালের সংখ্যা হ্রাস চিহ্নিত করে ড্যাম, ব্যারেজ, সেচ খাল, কৃত্রিম বাঁধ, পলি প'ড়ে নদীর গতিপথ বদলে যাওয়া, বালি-খাদান, সীসা আর ক্যাডমিয়ামের মতো ধাতুর জন্য বেশি মাত্রায় ঘ'টে চলা দুষণের জন্য নদীতীরবর্তী আবাসস্থলের ক্ষয় হয়ে চলেছে। সত্যিই বায়ু, জল, মাটির দূষণ এবং আবাসস্থলের পরিবর্তন আজকের ভারতবর্ষে জীববৈচিত্র্যের ওপর সবচেয়ে শক্তিশালী ভীতিরূপ। এই আসন্ন সঙ্কট WLPA–তে নিষিদ্ধ হওয়া প্রজাতি শিকারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। দূষণ এবং আবাসস্থল ধ্বংস করাকে রীতিমতো উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে যার জন্য দেশের প্রকৃতি পরিবেশ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় হল আমাদের দেশের পল্যুশন কন্ট্রোল বোর্ডগুলো বহির্সজ্জায় মনোনিবেশ করে আছে এবং সৎভাবে কোনো রেকর্ড রাখছে না। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে EIA (Environment Impact Assessment) ২০২০-র বিজ্ঞপ্তিতে। ঘোষণায় ভয়ঙ্কর দূষণকারী, এমনকি লাল সতর্কতাযুক্ত শিল্পকেও কৌশলগতভাবে জরুরী ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে এবং গণবিবেচনা বা গণশুনানির থেকে তাদের এভাবে আড়াল করা হয়েছে।

সারা দেশে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আবাসস্থল নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই চলেছে। জঙ্গল এলাকায় চাষবাসের প্রসারের ফলে আবাসস্থলের পরিবর্তন এর মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ একটি ঘটনা। তার চেয়ে অনেক বেশি ক'রে দায়ী হল ধনীদের জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকা, রাজসড়ক এবং রেললাইনের নির্মাণ, বন্দর এবং বিমানবন্দর। এই নির্মাণকাজে সাহায্য করতে পাথরখাদান, বালিখাদান, চুনাপাথরের খাদান, কয়লা খনি হচ্ছে ও অন্যান্য খনিজ উত্তোলন চলছে। মহারাষ্ট্রের সমৃদ্ধি হাইওয়ে সারা রাজ্য জুড়েই তার বিস্তৃতি কায়েম করেছে। পথে কোনো টিলা থাকলেও তাকে আদৌ তোয়াক্কা করে না সে। সোজা সেসব ভেদ ক'রে জঙ্গল তথা বন্যপ্রাণীদের আবাসভূমি ধ্বংস ক'রে এগিয়ে যায়। যেসব ঝর্ণা আশপাশের গ্রামের চাষের প্রাণ, সেগুলোকেও ধ্বংস করে। বসতহীন বন্যপ্রাণীরা গ্রামে গ্রামে হানা দেয়। হায়নারা গৃহপালিত পশুদের আক্রমণ করছে এবং চিতাবাঘেরা মানুষদের গুরুতরভাবে জখম করছে।

প্রকৃতির ভারসাম্য

আরেকটা ছদ্মবিজ্ঞান আছে যা প্রকৃতির ভারসাম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রকৃতি সবসময়ই প্রবাহমান। বিবর্তনগত বা বাস্তুতান্ত্রিক— কোনো সময় পর্যায়েই প্রকৃতিতে ভারসাম্য ছিল না। চার লক্ষ কোটি বছর আগে জীবনের জন্ম হয়েছিল। সেইসময় থেকেই যদি সবটা ভারসাম্যে থাকত তবে এখন শুধুই বায়বীয়, সালোকসংশ্লেষে অক্ষম আদীম জীব বেঁচে থাকত গভীর সমুদ্রে, সমুদ্রের ভেতর যেখানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটে চলে। কিন্তু জীবন কখনো ভারসাম্যে থাকেনি। দুই লক্ষ কোটি বছর আগে এরা সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছিল স্থলভাগের স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায়। এরপর ক্রমশ এরা বসতি তৈরি ক'রে ফেলে বাকি ভূখন্ড, এমনকি বায়ুতেও। প্রাণ বিবর্তিত হয়েছে সরল এককোষী জীব থেকে জটিল ছত্রাক, গাছপালা এবং প্রাণীতে। আমাদের প্রজাতিটিই ৩ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল এবং ভারতে তারা বসতি গ'ড়ে তোলে ৬৫ হাজার বছর আগে। প্রসঙ্গত সেইসময়ে এই মহাদেশে এশীয় হাতি আদৌ ছিল না; এই প্রজাতিটা অনেককাল পরে এসেছে। অর্থাৎ বেদখল নিয়ে কথা বলতে হলে বলতে হবে যে হাতি মানুষের বাসস্থান বেদখল করেছে। বাস্তুতান্ত্রিক সময়ের মানদণ্ডেও নিরন্তর গতিশীল পরিবর্তনের কথা দেখা যাচ্ছে। Indian Institute of Science-এর Centre for Ecological Sciences–এ ১৯৮৮-৮৯ সাল নাগাদ আমরা ৫০ হেক্টর জায়গার ওপর পর্ণমোচী বৃক্ষের একটি স্থায়ী ক্ষেত্র তৈরি করেছিলাম তামিলনাড়ুর মুদুমালাই-এর অরণ্যে। এই ক্ষেত্রটিতে ৭১-টি প্রজাতির মোট ২৫,৯২৯-টি বৃক্ষ, যাদের DBH (diameter at breast height) ছিল ১ সেন্টিমিটারের ওপর, তাদেরকে চিহ্নিত ক'রে, পরিমাপ ক'রে, মানচিত্র তৈরি ক'রে, তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করা হয় এখনো পর্যন্ত; আমার সহকর্মী সুকুমার তা করেন। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহের গতিবিধি সংক্রান্ত দীর্ঘকালীন গবেষণার জন্য তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক বড় বড় প্লটের মধ্যে এটি একটি। ফলাফলে দেখা যায় যে এই সমস্ত প্লটগুলিতেই উদ্ভিদসমূহের মধ্যে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে।[১৪]

প্রাণীদের সংখ্যা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ?

প্রাণীদের সংখ্যার ছদ্মবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হল প্রকৃতিতে ভারসাম্য রয়েছে, তাই অরণ্য বাস্তুতন্ত্রের মধ্যেই প্রজাতিগুলির সংখ্যাগুলি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যাবতীয় সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে সাম্প্রতিককালে মানুষ জঙ্গল বাস্তুতন্ত্রে থাবা বসানোর কারণে। এইগুলি ভয়ানক ত্রুটিযুক্ত বক্তব্য, কারণ প্রাণীরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোথাও থাকে না। এই পরিস্থিতির সত্যতা যাচাই করতে প্রয়োজনীয় হল আগ্রহের প্রাণীর প্রজাতিটির সংখ্যা তার সমগ্র ব্যপ্তিতে জানা। আমি এ বিষয়ে ১৯৬৯ থেকে কাজ করছি;[১৫] এই সংখ্যার একটা বড় অংশ জঙ্গল-বসতির বাইরে থাকতে পারে, যা অবশ্যই অভয়ারণ্য এবং ন্যাশনল পার্কগুলোর বাইরে। এই ঘটনা ঘটেছে হাতি ও বনশুয়োরের ক্ষেত্রে। বনদপ্তরের সংখ্যাতত্ত্ব সর্বদাই অবিশ্বাস্য, যেমন সারিস্কাতে দেখানো হয়েছিল। এমনকি এইচ এস পাবলা-র মত একজন বিশেষজ্ঞ, যিনি মধ্যপ্রদেশের মুখ্য বন্যপ্রাণ তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, কেউ হলপ করে বলতে পারবে না, কিন্তু গির ন্যাশনল পার্কের বাইরেই অন্তত ৬০% সিংহ রয়েছে।

কীভাবে সমগ্র ব্যাপ্তিতে প্রাণীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়? শিকার, রোগভোগ, খাদ্য, বাসা বাঁধার গর্তের অভাব এবং বন্যা, ধস ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে,

প্রাণীদের অন্তর্নিহিত প্রবণতাই হল সংখ্যা বৃদ্ধি। চার্লস ডারউইন একটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন যে এমনকি হাতির মতো ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করা প্রাণী সংখ্যায় বেড়েই চলবে যদি না এই বিষয়গুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবে ৭৫০ বছরে এই হাতিগুলো একটার ওপর আরেকটা চেপে এমন স্তুপাকৃতি ধারণ করবে যে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ দূরত্ব অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।[১৬] অবশ্যই বন বাস্তুতন্ত্রের ভেতর যে কাল্পনিক ভারসাম্য রয়েছে, তা বড় বড় বন্য প্রজাতিগুলির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা পালন করে না, বরং জঙ্গলের বাইরে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। শিকারকে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক বিষয় হিসেবে বুঝতে হবে এবং সর্বত্রই মানুষ ছিল সবচেয়ে বড় শিকারি সমস্ত প্রজাতির ক্ষেত্রেই, ভারতীয় উপমহাদেশে যেমন হাতি। যেমন আগেই বলেছি, হাতিরা মানুষের চেয়ে অনেকটা পরেই ভারতীয় উপমহাদেশে বসত করতে শুরু করেছে এবং তারা দৃশ্যমান হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষেরা তাদের শিকার করতে শুরু করে। নর্মদা নদীর উপত্যকায় ভীমবেটকার ১০,০০০ বছরের পুরনো গুহাচিত্রে এই শিকার চিত্রায়িত আছে । ২০০০ বছর আগে রোম্যান্টিক কবিতার একটি সংকলন লেখা হয়েছিল গথসপতাসাটি নামের একটি অঞ্চলে, যেখানে বর্ণনা করা আছে কীভাবে একজন যুবক কনে পাবার আশা করবে এবং একটা হাতি শিকার ক'রে তার পৌরুষ প্রমাণ করবে। কেরালার মুন্নারের ঝাঁ চকচকে টি এস্টেট মালিকদের টেবিলের পায়াগুলি তৈরি হতো শিকার করা হাতির পায়ের নীচের অংশ দিয়ে। এই শিকার হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল WLPA-র জন্য, দস্যু বীরাপ্পনের মতো জাজ্বল্যমান ব্যতিক্রমকে বন্দি হতে হল এবং ফলশ্রুতিতে সমস্ত প্রজাতির বন্যপ্রাণীরাই বড় মাত্রায় উধাও হতে লাগলো।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বদল এসেছে। Optimal foraging theory নামে বাস্তুশাস্ত্রবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা আছে যা প্রাণীদের খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়টিগুলিকে গুরুত্ব দেয়। প্রাণীরা এমন খাদ্যগ্রহণ করতে চায়, যেখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার পাবার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ে ও সবচেয়ে কম সম্ভাব্য ঝুঁকি নিতে হবে। সুকুমার দেখিয়েছেন যে এমনকি জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রে হাতির পছন্দমতো খাবার পাবার সুযোগ থাকলেও তারা কৃষিজমিতে হানা দেয় এবং ফসলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে (forage)। কারণ একই পরিমাণ চেষ্টায় তারা অনেকটা বেশি পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার সংগ্রহ করতে পারে ফসলের ক্ষেত থেকে। প্রাণীরা বুদ্ধিমান এবং নতুন নতুন সুযোগ উন্মুক্ত হলে তারা দ্রুত সুযোগগুলির উপযুক্ত ব্যবহার শিখে ফেলে। WLPA যেমন রয়েছে বন্যপ্রাণীরাও শিখে নিয়েছে কীভাবে নির্বিঘ্নে ফসলের ক্ষেতে হানা দিতে হবে অথবা লোকালয়ে হানা দিতে হবে কারণ মানুষ তাদের প্রতিহত করবে না। এর ফলশ্রুতিতে বন্যপ্রাণীদের জন্য অনেক বেশি খাবারদাবার সুলভ হয়ে যায়, আরও বেশি ক'রে তাদের বাড়তে সাহায্যও করে।

মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত

মানুষ-বন্যপ্রাণ দ্বন্দ্ব আজকের ভারতবর্ষে সর্বব্যাপী। ২০২১-এর মার্চ মাসে মধ্যপ্রদেশের মুখ্য বন্যপ্রাণ তত্ত্বাবধায়ক শ্রী এইচ এস পাবলা এবং বিখ্যাত সংরক্ষণ জীববিজ্ঞানী ডঃ এ জে টি জন সিং, সরকারের কাছে একটি নোট জমা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি লিখেছিলেন, "মানুষ-বন্যপ্রাণ দ্বন্দ্ব ভারতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট বড় সমস্যা। প্রত্যেক বছর প্রায় হাজার খানেক মানুষ মারা যায় হাতি, নেকড়ে, বাঘ, স্লথ ভল্লুক-এর হাতে, তার চেয়ে হাজারগুণ

মানুষ আহত হয়। হাতি, বনশুয়োর, নীল গাই, কৃষ্ণসার হরিণ, গাউর বা ভারতীয় বাইসন ইত্যাদি প্রাণীরা হাজার হাজার কোটি টাকার ফসল, সম্পত্তি নষ্ট করে। সাধারণ মানুষ সরকারি অনুমতি ছাড়া স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করতে, এমনকি হানাদার পশুদের তাদের ঘরদোর এবং ফসলের ক্ষেত থেকে তাড়াতেও পারে না।[১৭] এটা সংঘাতের মাত্রার একটা মোদ্দা এবং তৈরি আন্দাজ, যদিও বন ও বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অস্পষ্টতায় আবৃত।[১৮] বন্যপ্রাণ সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় একমাত্র কিছু সংরক্ষিত এলাকায় বিশ্বাসযোগ্যতাহীন ক্ষেত্র সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে। শ্রী এইচ এস পাবলা সহমত হয়েছেন যে বেশ বড় সংখ্যাক বন্যপ্রাণী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের বাইরে। উদাহরণস্বরূপ, সংরক্ষিত অঞ্চলের বাইরে মোট সিংহের কত অংশ সিংহ বসবাস করে তার নির্ভরযোগ্য কোনো হিসেবও নেই। মহেশ রঙ্গরাজনের হিসেব মতো গির জাতীয় পার্কের বাইরে ২০% সিংহ রয়েছে, যেখানে পাবলার মতে ৬০%-ই ওই অরণ্যগুলির বাইরে রয়েছে। গবেষণামূলক রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করলে দেখা যাবে ভারতে মানুষ-বন্যপ্রাণ দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রত্যক্ষ কোনো গবেষণা হয়নি, তার বদলে গবেষণাগুলি সংরক্ষিত এলাকার কাছাকাছি অঞ্চলে মানুষের মনোভঙ্গি, ধারণা, ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছে।[১৯]

বস্তুত WLPA-র মতো একটা অস্ত্র ব্যবহার ক'রে একটি অত্যাচারী শাসন রাজত্ব করতে আরম্ভ করল আমাদের সারাদেশে; শুধুমাত্র গ্রাম বা জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাতেই নয়, দিল্লির একেবারে হৃদয়ে, চিত্তরঞ্জন পার্কে। সেখানে বাঁদররা মানুষদের আক্রমণ করছে এবং কামড়াচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিরক্তিকর হল বনশুয়োর শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞাটি। International Union for Conservation of Nature (IUCN) বেশীরভাগ বন্য স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়াও সারা পৃথিবীর সংরক্ষণের হালহকিকতের নির্ভরশীল, যত্নবান তথ্য রক্ষা করে। ওরা বনশুয়োরকে সবচেয়ে কম চিন্তার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাস্তবত, ইউরোপ ও কানাডার বনাঞ্চলের মতো ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মতোই ভারতেও এদের সংখ্যা বাড়ছে। ভারতের ক্ষেত্রে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকলেও, সারা ভারতের চাষিরাই জানাচ্ছে যে এদের সংখ্যা বাড়ছে। এটি শুধুমাত্র জঙ্গল লাগোয়া অঞ্চলে নয়, বরং মানুষের ক্ষেত্রে জঙ্গল থেকে অনেক দূরের জায়গাও ভয়াবহ বিপদের চেহারা নিয়েছে। যেমন, মহারাষ্ট্রের এমন এক তালুকে যেখানে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে কম হয়। যেহেতু এখন আইন রয়েছে, তাই কোনো বনশুয়োর একজন চাষির ফসল নষ্ট করলে, সেই চাষি বনশুয়োর মারতে পারে বন আমলাতন্ত্রের লাল সুতোর ফাঁসে অনেকটা জড়িয়েজাপ্টে থাকার পর। বনশুয়োরের মৃতদেহটি আধিকারিকদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে, যারা ময়নাতদন্ত করবে। তারপর তাকে পোড়ানো হবে বা অন্য কোনোভাবে ধ্বংস করা হবে। ইসলামের মতো কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বনশুয়োরের মাংস সারা পৃথিবীতে সমাদৃত এবং প্রোটিনের মূল্যবান উৎস হিসেবে পরিবেশিত হয়; যেভাবে ওবেলিক্স নামে বিখ্যাত কার্টুন চরিত্রটিও এই খাদ্য উদযাপন করেছে। জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য দেখাচ্ছে যে সারা ভারতে উচ্চমাত্রার অপুষ্টি রয়েছে। মানুষকে এই প্রয়োজনীয় প্রোটিনটুকু থেকেও বঞ্চিত করা অন্যায়, অবিচার। এক্ষেত্রে অন্যায় আরো বেশি কারণ, এর ফলে ফসল পাহারা দেওয়াও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে চাষিরা কম পছন্দের ফসল চাষের দিকে সরে যাচ্ছেন অথবা কৃষিই পরিত্যাগ করছেন। দুঃখজনকভাবে এইসব অবিচার সামাজিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, নির্লজ্জভাবে আইন লঙ্ঘনের মধ্যে দিয়ে। ঘোড়ার পিঠে বনশুয়োর বাঁধা ভারতের রাজারাজড়াদের এবং জায়গীরদারদের একটা পুরনো খেলা ছিল; কোলাপুরের মারাঠারাজ ছত্রপতী শিবাজির বংশধর ছত্রপতি শাহ মহারাজ-ও

(১৮৭৪-১৯২২) এই খেলা খুবই পছন্দ করতেন। এই খেলাটি ছিল উঁচু ঠাটবাটের একটা প্রতীক। এই খেলাটা WLPA বলবৎ হবার পরও একইরকম রমরম করে চলেছে। এক্ষেত্রে শুধু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল নব্য ধনী কৃষক, ধনী শহুরে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক এবং কর্মচারীরা। যাদের খেলার একটা উদ্দেশ্য হল জায়গীরদারদের এবং উচ্চবর্ণের মারাঠা পরিবারের সমতুল্য জাতে ওঠা। শিকারিরা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন লাইসেন্সড রাইফেল এবং শটগান ব্যবহার করতো খেলা, ফসল সংরক্ষণ এবং আত্মরক্ষার জন্য। তারা স্থানীয়দের ভাড়া করতো ঝোপঝাড়ে লুকোনো জায়গা থেকে শুয়োর তাড়ানোর জন্য বা শিকারিরা তাকে হত্যা করার জন্য আগে থেকে যে স্থানে অপেক্ষা করবে কৃষিজমি থেকে সেইস্থানে শুয়োরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এই শিকার সংগঠিত হয় বার্কিং ডিয়ার বা কাকর হরিণ, সম্বর হরিণ, খরগোস, বনময়ূরী ইত্যাদিদের ক্ষেত্রেও। এই মাংস ভাগ হয় এবং বিতরিত হয় বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার পরিজনদের মধ্যে। যারা এই শিকারে সাহায্য করেছে, তাদেরকেও এই মাংসের ভাগ দেওয়া হয়।

এই আইনভঙ্গকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন বলিউডের সুপারস্টার সালমান খান। যিনি ফুর্তির জন্য কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা করেছিলেন ১৯৯৮ সালে। তাঁকে যোধপুর কোর্ট WLPA–এর ৫১ নম্বর ধারায় দণ্ডিত করেছিল। যার সর্বোচ্চ সাজা হল ৬ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং সর্বনিম্ন সাজা হল ১ বছরের কারাদণ্ড। কিন্তু ২০২১ সালে, তিনি এখনো স্বাধীনভাবে তার ভক্তদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই ভক্তরাই সালমানকে হাতেনাতে ধ'রে ফেলা বিশনোইদের অভিসম্পাত করেছে। কিন্তু দুর্বল এবং গরীব মানুষরা আইন নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। এ দেশের চাষিরা, যারা বনশুয়োরের দ্বারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নানাভাবে— কখনো ফসলের ক্ষতি, কখনো কখনো মানুষের আহত হওয়া আবার কখনো মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তাই, মানুষ হয়তো আইনকে কেবল উপেক্ষা করে। কেরালার একটা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে যেসব গ্রামে গ্রামবাসীরা কৌমগতভাবেই বনশুয়োর শিকার করে, সেখানে বনশুয়োরের দ্বারা ক্ষতিও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অন্য সর্বত্র এই ক্ষতি ক্রমবর্ধমান। WLPA ভাঙার একটা জ্বাজ্জল্যমান উদাহরণ হল উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি, যেখানে আইনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সমস্ত প্রজাতির পাখি ও স্তন্যপায়ীর বিপুল ব্যাপ্ত শিকার হতে দেখেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে।

বীরাপ্পন

জঙ্গল এবং বন্যপ্রাণ আইন লঙ্ঘনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উদাহরণ হল কুজ মুনিসামি বীরাপ্পন (১৯৫২-২০০৪), যে ডাকাত ৩৪ বছর ধ'রে সক্রিয় ছিলেন; যিনি বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের অপহরণ ক'রে মুক্তিপণ দাবি করতেন। তিনি চন্দনকাঠ চোরাচালান এবং হাতি পাচারের জন্য তামিলনাড়ু, কর্নাটক এবং কেরালা এই তিনটি রাজ্যে অভিযুক্ত ছিলেন। তিনি ২০০০ হাতি, ১৬ কোটি টাকার হাতির দাঁত এবং ৪৩ কোটি টাকা মূল্যের চন্দনকাঠ পাচার করেছেন। তাঁকে খোঁজা হচ্ছিল ১৮৪ জন মানুষকে খুন করার অপরাধে যার অর্ধেক হল পুলিশ আধিকারিক এবং বন আধিকারিক, বিখ্যাত রাজনীতিক এবং বিখ্যাত ব্যক্তি, যাদেরকে অপহরণ করা হয়েছিল মুক্তিপণের জন্য। বীরাপ্পনকে পাকড়াও করার যুদ্ধে কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর সরকারের মোট খরচ হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। তিনি সুদীর্ঘকাল ধ'রে এমনটা করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র স্থানীয় গ্রামবাসীদের বহুধাবিস্তৃত সমর্থনের জন্য। ১৯৮০-র শুরুর দিকে, আমি জানতাম, তামিলনাড়ুর ইরোডে কিছু প্রকৃতি সংরক্ষণকারী বীরাপ্পনকে নিন্দা ক'রে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন

করতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয় কারণ বহু স্থানীয় মানুষ তাদের বিক্ষোভে হামলা করার হুমকি দিয়েছিল এই ব'লে যে বনাধিকারিকরা তাদের শুধুই হেনস্থা করেছে, তাদেরকে সুস্থভাবে উপার্জন করতে এবং বাঁচতে দেয়নি। তারা বীরাপ্পনের প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ বীরাপ্পন তাদের ভীষণ প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান এবং রোজগার দিয়েছিলেন।

অসাংবিধানিক আইন

WLPA আইনে, মানুষ স্বাধীনভাবে লুঠতরাজরত প্রাণীদের তাড়াতে পারবেন না; এমনকি তাদের বাড়ি বা ফসলের জমি থেকে প্রাণীদের তাড়াতে গেলেও সরকারি অনুমতি নিতে হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০০ এবং ১০৩ নং ধারা অনুযায়ী স্বেচ্ছায়/ইচ্ছাকৃতভাবে কারুর মৃত্যুর কারণ হওয়া অথবা দুষ্কৃতিদের/অপরাধীদের অন্য কোন ক্ষতি করতে পারে যদি (১) একজন অন্যায়কারীর করা একটি হেনস্থা/অপরাধ/আঘাতের ফলে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের যথেষ্ট ভয় থাকে। (২) যদি এই অনিষ্টকারী তাদের বাড়ি এবং সম্পত্তিতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে অথবা ডাকাতি করে। বনশুয়োর কখনো সখনো মানুষ মারে, তারা নিয়মিত চাষিদের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে, তার উৎপাদিত দ্রব্য চুরি করে। হাতিরাও তাই করে এবং বাঘেরা মানুষ মারে এবং চাষিদের কুকুর এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু লুঠ করে। আমার দুই ব্যক্তিগত বন্ধু, একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক এবং অবসরপ্রাপ্ত উচ্চন্যায়ালয়ের বিচারক আমায় বলেছিলেন যে WLPA স্পষ্টতই সাংবিধানিকভাবে বৈধ নয়।

বিশ্বময় বন্যপ্রাণ ব্যবস্থাপনা

ভারতবর্ষ বাদ দিয়ে কোনো দেশেই ন্যাশনল পার্ক, বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য এবং ক্রীড়া উদ্যানের বাইরে শিকার করা নিষিদ্ধ নয়। নেকড়ের মতো কিছু বিপন্ন প্রজাতিদের শিকার করা সর্বত্রই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এমনকি এটাও সার্বজনীন নয়। আমেরিকার স্টেট অফ আলাস্কায় নেকড়ে শিকারকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ায় সদর্থক উৎসাহের (positive incentive) একটা ব্যবস্থা আছে। অস্ট্রেলিয়ার ভেড়াদের খামারের মালিকরা ক্যাঙারু শিকার করে ভেড়ার প্রতিযোগী হিসাবে। সরকার তাদের কাছে ডাক বা bid করতেন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্যাঙারুকে তাদের খামারে থাকতে দেওয়ার বিনিময়ে কত টাকা বিনিময়মূল্য দিতে হবে, তা জানতে চেয়ে। সবচেয়ে কম ডাকটিকেই গ্রহণ করা হয় স্বচ্ছ ভেরিফিকেশনের মধ্যে দিয়ে।
স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ বিষয়ে সত্যিকারের একটি যুক্তিসঙ্গত পন্থা গ্রহণ করেছে। তারা জোর দিয়ে বলেছে যে নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘকালীন ব্যবহারের পক্ষে শিকার একটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ। এই দেশগুলি সারা পৃথিবীতে পরিবেশগত কর্মক্ষমতা এবং সুখের সূচক— উভয় ক্ষেত্রেই সেরার শিরোপা পেয়েছে। সেই একই সময়ে একইসঙ্গে এইসব দেশের বহু বহু হিমায়ক বা ফ্রিজারেই রেইন ডিয়ার নামক হরিণ, শিয়াল কিংবা মুজ নামক হরিণের মাংস ঠাসা থাকে। স্যুইডেনের আইনগুলোর মধ্যে এইসব বিধান রয়েছে। (১) জীবন্ত বন্যপ্রাণী কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, কিন্তু জমিমালিকরা তাদের জমিতে শিকার করতেই পারে এবং অন্য শিকারিদের লিজও দিতেই পারে। (২) ক্রীড়ার মাংস একটি বাণিজ্যিক পণ্য যা খোলা বাজারে বিক্রি হতে পারে এবং যাকে এই সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করা হয়। (৩) স্থানীয় দায়বহনকারী বা স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতায়ণ করা হয়, সিদ্ধান্ত

গ্রহণকে বিকেন্দ্রীভূত করার মধ্যে দিয়ে। (৪) মুজ নামক হরিণের মতো কয়েকটি প্রাণী বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ক্রমশ বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে অনুমতিপ্রদানে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে। জমি মালিকদেরকে ক্রীড়া পশুদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাদের জমিতে একটি নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারক কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে শিকারিদের থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। (৫) বন্যপ্রাণীদের শুধুমাত্র যথাযথ কারণেই হত্যা করা যেতে পারে বিনোদন অথবা মাংস পাবার জন্য। আইনত এই বন্যপ্রাণীদের হত্যা করা যায়, আত্মরক্ষার স্বার্থে অথবা সম্পত্তি রক্ষা করতে।
মনে রাখতে হবে যে এমনকি স্যুইডেনের ন্যাশনল পার্ক East Vättern Scarp Landscape Biosphere Reserve-এর ভেতরেও নিয়ন্ত্রিত শিকার বৈধ। এর ভূরূপ রুক্ষ। বহু ছোট ছোট জলপথ একে কেটেকুটে গেছে। বনভূমি এবং কৃষিজমিরই আধিপত্য রয়েছে এখানে। কিছু গ্রাম রয়েছে এবং কিছু জনবসতি রয়েছে যার মধ্যে ছোট জোত এবং ব্যক্তিগত ঘরবাড়িও রয়েছে। স্যুইডেনের সমস্ত বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবং তা বাদেও শিকার করা সর্বত্রই আইনী চৌহদ্দির মধ্যেই রয়েছে। প্রসঙ্গত, বিশেষ নজর দিয়ে ন্যাশনল পার্কের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা গোষ্ঠীগুলির জন্য এবং বন্যপ্রাণীদের সংখ্যার নথিভুক্তিকরণের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে। মজার বিষয় হল যে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোর প্রকৃতি সংরক্ষণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একেবারে পৃথক। যেমন, পবিত্র পাখি হিসেবে স্টর্ক-এর সংরক্ষণ।

মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বনদপ্তর এবং WLPA হল সংরক্ষণের অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হাতিয়ার। যেভাবে এগুলি কাজ করে তাতে চাষি, কৃষিমজুর, গ্রামীন হস্তশিল্পী এবং বনবাসী মানুষেরা পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে বনদপ্তরের নাগপাশকে সমান ক'রে দেখেন এবং সমস্ত সংরক্ষণের উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করেন। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বাস্তুতন্ত্র বিশেষজ্ঞ দলের এটা একটা হাতে গরম শিক্ষা। এই কাজটির অংশ হিসেবে আমি সাভাতোয়াদী, ডোডামার্গ; সিদ্ধুদুর্গ জেলার ডোডামার্গ তালুকের বহু গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাদের প্রস্তাব দিয়েছি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ছিল সরকারের প্রাথমিক একক এবং তারা যেন তাদের নিজেদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ পরিকল্পনা করে এবং তারা চাইলে তাদের স্থানীয় অঞ্চলগুলিকে বাস্তুতান্ত্রিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে। এইসময় ২৫-টা গ্রামসভায় দুর্দান্ত সাড়া পাওয়া গেছিলো। এর মধ্যে অনবদ্য বিষয়টি ছিল তাদের অঞ্চলগুলিকে বাস্তুতান্ত্রিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং অঞ্চলগুলির জন্য সবচেয়ে জুতসই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব উঠে আসা। প্রস্তাবিত উন্নয়ন উদ্যোগগুলির মধ্যে ছিল স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফল, ইকোট্যুরিজমের প্রসার এবং জলাশয় উন্নয়ন। যে সংরক্ষণ প্রকল্পটিতে তারা সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল, সেটা হল খনি নিষিদ্ধকরণ।[২০] গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের এই অভিব্যক্তি দেখে শঙ্কিত হয়ে খনি গোষ্ঠীর সমর্থক এক রাজনীতিক গ্রামবাসীদের বলতে শুরু করে যে ESA(Environmentally Sensitive Area বা পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা)-এর মর্যাদা চাওয়া মানেই সংরক্ষণের প্রয়োগ নয় এবং তাদের পছন্দসই উন্নয়ন কার্যক্রম এমন নয় বরং বনদপ্তরের অত্যাচারের কবলেই পড়া।

একইভাবে, Kerala Ecofragile Lands Act (২০০৩)-এর অভিজ্ঞতা মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সংরক্ষণ বলতে বোঝায় জবরদস্তি এবং অন্যায় দাবিদাওয়া। এমন অভিযোগ রয়েছে যে দানবীয় EFL আইন কোনোরকম বৈজ্ঞানিক কারণ ছাড়াই বনদপ্তরকে সংরক্ষিত এলাকার কাছাকাছি ইচ্ছেমতো যে কোন জমিকে 'পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর' আখ্যা দেবার অনুমতি দিয়েছিল। সমস্ত ব্যক্তিগত অধিকার তখনই শেষ হয়ে গেছে। ৩৭,০০০ একর জমি থেকে কোনোরকম ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ৮,০০০-এর ওপর চাষি উৎখাত হয়েছে। গ্রামসভাগুলো এই জমিগুলো চিহ্নিতকরণে আদৌ যুক্ত ছিল না। বনদপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জমি অধিগ্রহণ করা হবে ক্ষেত্র-পরিদর্শন ছাড়াই। আপাতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসাররা তখন থেকে আবার জোর ক'রে ঘুষ আদায় করতে থাকে যখন WGEEP রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। WGEEP রিপোর্টের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য কায়েমি স্বার্থের দ্বারা এটিকে কাজে লাগানো হয়েছিল।[২১]

ভারতীয় ঐতিহ্য শাসনের চারটি অস্ত্র সম্পর্কে কথা বলে— সাম বা মীমাংসা, দাম বা পুরষ্কার, দন্ড বা শাস্তি এবং ভেদ অথবা মানুষকে বিভক্ত করা। আজকের পরিবেশগত সংরক্ষণ-এর শাসন প্রোথিত আছে দন্ডের ওপর, বনদপ্তরের অত্যাচারের ওপর এবং ভেদাভেদ বা প্রতিটি মানুষকে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়ানোর ওপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চাষিদের কীটনাশক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হল, যা মৎস্যজীবীদের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে সাধারণ মানুষ পরিবেশগত সংরক্ষণ অর্জন করেছেন বহু শতাব্দী ধ'রে। সেই মানুষরাই তাদের পরিবেশ, তাদের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন। ১৯৮৮-তে রাজস্থানের বিশনোইরাই আশঙ্কা করেছিল যে সালমান খান কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করেছে এবং বছরের পর বছর অবিশ্বাস্যভাবে তারা সেই মামলা চালিয়ে চলেছে। গোয়া তাদের সবুজ আচ্ছাদন ধ'রে রাখতে পেরেছে তাদের গ্রামের কৌম "communidade" ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। তাদেরকে মারাত্মক ফলাফল ভোগ করতে হয়েছে সাধারণ সম্পত্তিকে কায়েমী স্বার্থের কবল থেকে রক্ষা করতে। আমার বন্ধু বিস্মার্ক দায়াল স্থানীয় "communidade"–এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে অত্যন্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে মারা যান। উনি একটি পাহাড় দখল করে পাঁচতারা হোটেল তৈরির প্রতিরোধ করছিলেন। অতি সাম্প্রতিককালে বনদপ্তর চুপ করে থাকলেও, গোয়ার মানুষরাই মোল্লাম ন্যাশনল পার্ক দিয়ে যে রেলওয়ে লাইন যাচ্ছিল তার প্রতিবাদ করেছিলেন।[২২] এর চেয়েও খারাপ হল— বনদপ্তর প্রস্তাব দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের সংরক্ষিত অরণ্যের ৪০% শিল্প কারখানাকে হস্তান্তরিত করবে জঙ্গলসাফ করবার জন্য, পরিবর্তে কিছু বিদেশি, দ্রুত বেড়ে ওঠা প্রজাতির গাছের বাগান করবে। এখানেও সেই সাধারণ মানুষরাই প্রতিবাদ করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে বাধ্য করেছেন রাজি না হ'তে।[২৩]

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ শুধুমাত্র নচ্ছার পুঁজিপতিদের এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বাবুদের এবং নেতাদের সুবিধেই দেয়, যারা আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করে এবং নষ্ট ক'রে দ্রুত বিপুল অর্থ উপার্জন করে। যার মধ্যে রয়েছে বহু দূষক শিল্প কারখানা, খনি, খাদান নিয়ন্ত্রকরা, রিয়েল এস্টেট গোষ্ঠী এবং জঙ্গলভিত্তিক কারখানা। ২০২০ সালের মে মাসে একটা প্রাসঙ্গিক ঘটনায় দেখা যাবে, ভয়ানক বেদনাদায়ক করোণাসম্পর্কিত লকডাউনের শেষে এক বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী নির্মাণ শ্রমিক ব্যাঙ্গালোর ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ইয়াদুরাপ্পা ট্রেন বাতিল করে দেন এবং নির্মাণ শিল্পের মজুরদের যৎসামান্য মজুরি বহাল রাখার স্বার্থে তাদেরকে ব্যাঙ্গালোরেই ফিরে যেতে বাধ্য করেন। আমাদের অর্থনীতির পণ্ডিতরা ধনী ও ক্ষমতাবানদের সাধুবাদ দিতেই থাকবেন এবং তাদের সেইসব পৃষ্ঠপোষণাকে 'সংস্কার' আখ্যা দেবেন। তারা নষ্ট পরিবেশের ক্ষতিগ্রস্তদের/অত্যাচারিতদের বন্যপ্রাণীর হামলার মুখে ঠেলে

দেয় আবার সামান্য মজুরির বিনিময়ে অনেকটা দীর্ঘ শ্রমঘন্টার মুখে ঠেলে দেয়, যার পোশাকি নাম হয় 'শ্রম সংস্কার'। একই সঙ্গে তারা দুর্বল ও গরিব মানুষের সান্নিধ্যে থাকাকে 'সস্তা জনপ্রিয়তা' ব'লে গাল পাড়ে।

গরিব ও ধনী উভয়কেই দান খয়রাত ক'রে চলা অবশ্যই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহারকেই প্রশ্রয় দেয় এবং তা প্রগতির অন্তরায়। শিক্ষাটি খুব স্পষ্ট। তৃণমূলস্তরে থাকা মানুষদেরকে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। দন্ডকে দূরে সরিয়ে রেখে, বনদপ্তরের ছড়িকে সাম বা মীমাংসা দিয়ে প্রতিস্থাপন ক'রে এবং দাম বা সদর্থক উৎসাহ দিয়ে, দায়িত্বের সঙ্গে বন্য পাখি এবং স্তন্যপায়ীসহ সমগ্র জীববৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভারকে সংরক্ষণ করতে হবে।

আগামীর পথ

আমাদের সংবিধান এবং বহু আইন গণতান্ত্রিক এবং সেগুলি মানুষের পক্ষে, জ্ঞানের পক্ষে, জীববৈচিত্র্যকে প্রতিপালন করার জন্য প্রকৃতিলগ্ন কাঠামোর পক্ষে। এগুলি বর্তমান বনদপ্তর শাসিত প্রকৃতিবিরূপ, অগণতান্ত্রিক এবং জনবিরোধী পরিকাঠামোকে প্রতিস্থাপনেরও পরিসর দেয়। সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪ তম সংশোধনী অনুযায়ী গ্রামসভা/ওয়ার্ডস্তরে নাগরিক গোষ্ঠীর সদস্যদেরই পরিবেশের হালহকিকত-এর রিপোর্ট তৈরি করার নিয়ম রয়েছে। এই রিপোর্টগুলি স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের উপাদান এবং তাদের বাস্তুতন্ত্রের তথ্য পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারে। ওয়ার্ড ও গ্রামসভাস্তরের রিপোর্টগুলি একত্রিত করে তৈরি হবে পঞ্চায়েত ও নগরপালিকা/মহানগরপালিকা রিপোর্ট। Biological Diversity Act বা জীববৈচিত্র্য আইনে স্থানীয় প্রশাসন যেমন পঞ্চায়েত/নগরপালিকা/মহানগরপালিকাস্তরে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি বা Biodiversity Management Committee (BMC) তৈরি করার কথা বলেছে। এই আইনটি BMC-তে স্থানীয় নাগরিকদের উপস্থিতির হার ও পদ-পরিচয় নির্ধারণের অধিকার দেয়। অতএব, বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনের এই BMC-গুলো দেশের জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম স্তর। এইভাবে একদল সদস্য ক্রমান্বয়ে তাদের উপরের স্তরের সদস্যদের নির্বাচন করতে পারবে। যেমন, জেলার স্তরের সদস্য হিসাবে, রাজ্য স্তর থেকে জাতীয় স্তরের জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষগুলি, উচ্চস্তরের কর্তৃপক্ষগুলি তাদের উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় করবে ও কাজ করবে। এভাবে গ'ড়ে ওঠা একটা জাতীয় জীব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ তখন আন্তর্জাতিকভাবে কথা বলতে পারবে। সমস্ত স্তরেই BMC-গুলি এবং জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষগুলিতে প্রশাসক থাকতে হবে যারা সম্পাদকের কাজগুলি করবেন, কিন্তু কোনও কর্তৃত্ব দেখাবেন না। এই ধরণের একটা বন্দোবস্ত আমাদেরকে আমাদের জীববৈচিত্র্যের ঐতিহ্যকে একটি সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে এবং আমাদের সাহায্য করবে একটা ন্যায়পরায়ণ এবং সমতার দিশায় এগিয়ে যেতে।

তথ্যসূত্র

১. Guha, R. 1996. 'Dietrich Brandis and Indian Forestry: A Vision Revisited and Reaffirmed'. In M. Poffenberger, B. McGean (eds.), Villages Voices Forest Choices. New Delhi: Oxford University Press, pp. 86-100.

২. Gadgil, M., and R. Guha. 1992. This Fissured Land: An Ecological History of India. Delhi: Oxford University Press. p. 274.

৩. Daniel, Paul Harris. 1969. Red Tea. Madras: Sankar Printers.

৪. Somanathan, E., Prabhakar, R., Mehta, B.S., 'Decentralization for Cost-Effective Conservation'. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106 (11) (2009): 4143–4147

৫. Ali, Salim. 'The Moghul Emperors of India as Naturalists and Sportsmen'. The Journal of the Bombay Natural History Society. 32 (1927): 34-63

৬. Gadgil, M. 'Salim Ali, Naturalist Extraordinary: A Historical Perspective'. Journal of Bombay Natural History Society. 75 (Suppl.), (1980) i-v

৭. Ali, Salim and S. Dillon Ripley. (1968-74). Handbook of the Birds of India and Pakistan. Vols 1-10. Bombay: Oxford University Press.

৮. Gee. E.P. (1952 – 67) The Management of India's Wild Life Sanctuaries and National Parks. Series of articles in Journal of Bombay Natural History Society. Vols. 51 – 64.

৯. Gadgil, M., Rao, P.R.S., Utkarsh, G., Chhatre, A. and members of the People's Biodiversity Initiative, 'New Meanings for Old Knowledge: The People's Biodiversity Registers Programme'. Ecological Applications 10 (5) (2000): 1307-1317.

১০. Wildlife Protection Act 1972 https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1972-53_0.pdf

১১. Safdar, Arafat. 2020. Criminalizing the Natives: A Study of the Criminal Tribes Act, 1871, Phd diss., University of British Columbia.

১২. https://www.andbeyond.com/destinations/africa/kenya/masai-mara-national-park/

https://www.bradtguides.com/destinations/africa/burkina-faso/nazinga-game-ranch/

১৩. Daniels, R.J.R., Hegde, M., Joshi, N.V. and Gadgil, M. Assigning Conservation Value: A Case Study From India, Conservation Biology, 5(4) (1991).:464 475

১৪. Long-term monitoring of vegetation in a tropical deciduous forest in Mudumalai, southern India.
R. Sukumar, H. S. Dattaraja, H. S. Suresh, J. Radhakrishnan, R. Vasudeva, S. Nirmala and N. V. Joshi. ' Long- term Monitoring of Vegetation in a Tropical Deciduous Forest in Mudumalai, Southern India', Current Science, 62 (9) (10 May 1992): 608-616

১৫. Gadgil, M. 'Dispersal: Population Consequences and Evolution'. Ecology, 52 (1971): 253 261

১৬. János Podani, Ádám Kun and András Szilágyi 'How Fast Does Darwin's Elephant Population Grow? Journal of the History of Biology, 51 (2018): 259–281

১৭. H S Pabla (pers comm) Patterns and Extent of HWC in India, June 8, 2021 .

১৮. Gadgil, Madhav and Chinmaya S Rathore. 2015. Current Status and Management of Scientific Information Relating to Indian Environment. Proceedings of the Indian National Science Academy 81 (5) (December 2015): 1087-1112 DOI: 10.16943/ptinsa/2015/v81i5/48344

১৯. Manral, U., S. Sengupta, S.A. Hussain, S. Rana and R. Badola 'Human Wildlife Conflict in India: A Review of Economic Implication of Loss and Preventive Measures', The Indian Forester, 142(10) (2016): 928–940.
Ogra, M. V. 2008. 'Human-wildlife conflict and gender in protected area borderlands: A case study of costs, perceptions, and vulnerabilities from Uttarakhand (Uttaranchal), India', Geoforum, 39, 3, 1408–22
Ogra, M.V. and Badola, R. 'Compensating Human–Wildlife Conflict in Protected Area Communities: Ground-level Perspectives from Uttarakhand, India', Human Ecology, 36(5) (2008): 717-29.

২০. Report of the Western Ghats Ecology Expert Panel, 2011

২১. Gadgil, M. 2014. 'Western Ghats Ecology Expert Panel: A Play in Five Acts'. Economic and Political Weekly, XLIX (18), May 03, 2014: 38-50

২২. Primer | What's #SaveMollem protest and why are Goans protesting? DECCAN CHRONICLE | TWINKLE GURNANI PublishedNov 8, 2020,

২৩. https://www.freepressjournal.in/indore/bhopal-cm-shivraj-singh-chouhan-turns-down-the-proposal-for-private-investment-in-degraded-forests